ঠিকানা নেই

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

ঠিকানা নেই

ঠিকানা নেই

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সাহিত্যম্।। কলকাতা
www.nirmalsahityam.com

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয়

ইতু ও জামাইবাবু

এক

সল্টলেকের তিন নম্বর সেক্টরে এক চাঞ্চল্যকর ডাকাতি ঘটে গেছে। বাড়িতে বুড়োবুড়ি ছাড়া কেউ ছিল না, ভরদুপুরে চারজনের একটা দল সদর্পে বেল বাজিয়ে বাড়িতে ঢুকে, কর্তাগিন্নির কপালে রিভলভার ঠেকিয়ে, বিস্তর টাকাপয়সা সোনাদানা হাতিয়ে ভাগলবা। পুলিশ যথারীতি লেট, অপরাধীদের সন্ধান চালাচ্ছে।

নিউজটা কভার করতে স্বাতীকেই ছুটতে হয়েছিল আজ। তাদের চ্যানেলে সন্দীপই এ ধরনের খবর করায় ওস্তাদ। কিন্তু সে আজ ছুটিতে। জীবনের প্রথম জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন সাঁটাচ্ছে। অগত্যা সামনে স্বাতীকে পেয়ে তাকেই হুকুম ঝাড়ল প্রবীরদা। স্বাতী কিন্তু বসে ছিল না। আসন্ন লিটল ম্যাগাজিন মেলা উপলক্ষে আধ ঘণ্টার প্রোগ্রাম বানাচ্ছে চ্যানেল, স্বাতীর ওপর ভার পড়েছে অন্তত গোটা চার-পাঁচ সাহিত্যিকের সাক্ষাৎকার নেওয়ার। কবে কখন কাকে ধরবে তার শিডিউল বানাচ্ছিল স্বাতী। প্রশ্নমালা সাজাচ্ছিল। তা সে সব রইল পড়ে, চিফ রিপোর্টার যখন ডিউটি দিয়েছে,

ডাকাতির সচিত্র বিবরণী আহরণ করে আনো যথা শীঘ্র সম্ভব। তা কাজটা স্বাতীর ভাল লাগুক, ছাই না লাগুক।

গিয়ে পৌঁছতেই যা বখেড়া। আসল কর্মটি সারতে কতক্ষণই বা লাগে! চুরি-ডাকাতি-খুন সুইসাইড যাই হোক, সবই তো রুটিন ওয়ার্ক। পুলিশের বাইট, ভিক্টিম পার্টির ইন্টারভিউ, প্রতিবেশীদের কমেন্ট, আর অকুস্থলের কয়েকটা ছবি, ব্যস।

সাড়ে পাঁচটার মধ্যে জবটা নামিয়ে দিল স্বাতী। সঙ্গে তপেশদা ছিল আজ ক্যামেরায়। যন্ত্রপাতিগুলো এখন গাড়িতে তুলছে। আরও দুটো চ্যানেলের রিপোর্টার ঘোরাঘুরি করছে কাছেপিঠে। স্কাই বি'র শ্যামল শিকদারের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে একটু হাই হ্যালো করতেই হল স্বাতীকে।

খাজুরা সেরে গাড়িতে উঠতে যাবে, হঠাৎই নারীকণ্ঠের ডাক—কী গো স্বাতীবউদি, চিনতে পারছ?

এখানে তাকে বউদি বলে কে ডাকে? স্বাতী ঘুরে তাকাল। অনিতা না? খড়দায় তার প্রাক্তন শ্বশুরবাড়ির পাড়ায় থাকত? মিশন পল্লির সেই বাড়িটায় আসতও মাঝে মাঝে।

পলকের জন্য স্বাতীর মনে হল চিনি না ভাব করে উঠে পড়ে গাড়িতে। কেন যেন পারল না। বুম হাতে এগিয়ে গিয়ে বলল—তুমি এখানে?

—আমি তো এখন এখানেই থাকি। এ পাড়াতেই বিয়ে হয়েছে।

—কবে হল বিয়ে?

—সামনের শ্রাবণে দু' বছর হবে। অনিতার মুখে গদগদ ভাব—তোমাকে তো আজকাল প্রায়ই দেখি টিভিতে। পরশুই তো কী একটা যেন ফাংশনের নিউজ করছিলে না?

—হ্যাঁ। নাট্যোৎসবের।

—তাই হবে। আমি তো শ্বশুরবাড়ির সবাইকে তোমায় দেখাই। বলি দ্যাখো দ্যাখো এই আমাদের স্বাতীবউদি। যেমনি স্মার্ট, তেমনি গুছিয়ে কথা বলে।

বউদি শব্দটা আবার খুট করে লাগল কানে। কাজে বেরিয়ে ওই

সম্বোধনটা শোনার অভ্যেস নেই যে। তার ওপর কিনা বলছে এমন একজন, যার বউদি ডাকের সুতোটা বহুকাল আগেই ছিঁড়ে গেছে এবং স্বাতীর বর্তমান বরটিকে যে চেনেই না।

স্বাতী তবু মুখে একটা হাসি হাসি ভাব ফোটাল—তুৎ, ওটা তো আমার চাকরি।

—তা হলেও...তোমার ক্রেডিট আছে। যা ঝড়ঝাপটা গেছে তোমার ওপর দিয়ে। দেখেছি তো...

এবার বেশ অস্বস্তি বোধ করল স্বাতী। পুরনো চেনাজানাদের সঙ্গে পথেঘাটে দেখা হওয়ার এই এক মুশকিল। যে কালো দিনগুলোর কথা সে প্রাণপণে ভুলে থাকতে চায়, এরা সেটা জোর করে স্মরণ করিয়ে দেবে। দেবেই।

প্রসঙ্গ ঘোরাতে স্বাতী বলল—এখানে একটা কাজে এসেছিলাম গো। ওই বাড়িতে একটা ডাকাতি...

—সে তো তোমায় দেখেই বুঝেছি। কী বিশ্রী একটা কাণ্ড হয়ে গেল...। বিষয়টা ছুঁয়েই অনিতা ফের বেরিয়ে এল—যাক গে, আছ কেমন এখন?

—ঠিকঠাক। ফাইন। খাটছি উদয়-অস্ত।

অনিতা সামান্য গলা নামিয়ে বলল—শুনছিলাম...তুমি নাকি আবার বিয়ে করেছ?

ব্যাপারটা যে আদৌ তেমন বিশাল কিছু নয়, একটা অতি স্বাভাবিক ঘটনা, এটা প্রমাণ করার জন্যই যেন বেশি সপ্রতিভ দেখাল স্বাতীকে। সহজ সুরে বলল—হ্যা, সে তো অনেক দিন। তিন বছর হয়ে গেল।

—ও। সিঁদুর পরোনি তো...তাই ঠিক বুঝতে পারছিলাম না...

—সিঁদুর ছেড়ে দিয়েছি। বড্ড চুল উঠছিল। আর আমার বর মোটেই অত গাঁইয়া নয়, যে মাইন্ড করবে। কথাটা বলতে পেরে বেশ পুলকিত বোধ করল স্বাতী। খুশি খুশি গলায় বলল—আমার একটা মেয়েও হয়েছে।

—ওমা, তাই? শুনে কী ভাল যে লাগছে! অনিতাও যেন আহ্লাদিত, —খড়দার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তুমি বেঁচে গেছ। যা অসভ্য একটা পরিবার...

—বাদ দাও। পাস্ট ইজ পাস্ট।

—সে তো বটেই। অনিতা সায় দিল। পরক্ষণে ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল,—তোমার ছেলে তো খড়দাতেই মানুষ হচ্ছে, তাই না।

প্রশ্ন তো নয়, যেন শরাঘাত। হৃৎপিণ্ডের চকিত আন্দোলনটা দমন করে স্বাতী কোনও ক্রমে বলল,—হুঁ। ওরা তো জোরজার করে রেখে দিল।

—খুব অন্যায়। ছেলেকে মায়ের কোলছাড়া করতে আছে? তা ছেলে তোমার কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকে নিশ্চয়ই?

—ওই...মাঝে মাঝে...। সত্যিটা তো বলা যায় না, তাই ব্যস্ততার ভান করে অনিতাকে এড়াল স্বাতী,—চলি গো। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার জন্যে ওয়েট করছে ওরা।

—এক সেকেন্ড। তোমার মোবাইল নাম্বারটা দেবে?

—কেন? কী করবে?

—আরে বাবা, তোমরা হলে গিয়ে মিডিয়ার লোক। হাতে কত ক্ষমতা। যদি কখনও কোনও দরকারে লাগে...

স্তুতিটা পরিহাসের মতো বাজল স্বাতীর কানে। মিডিয়ায় চাকরি করে বলে কত কী যে ধারণা করে নেয় মানুষ! ছেলেকে সামান্য একবার দেখতে পাওয়ার জন্য স্বাতীকে যে কী ভিখিরিপানা করতে হয় তা যদি জানত অনিতা!

কথা না বাড়িয়ে নাম্বারটা দিয়ে স্বাতী বড় বড় পায়ে গাড়িতে এল। বসেছে হেলান দিয়ে। ড্রাইভার স্টার্ট দিতেই বলল,—এসিটা একটু বাড়িয়ে দিন না, প্লিজ।

তপেশ পাশ থেকে বলল,—হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুল করে দিন। এবার বোশেখ জোষ্ঠি পুরো ভাজা ভাজা হয়ে গেলাম।

ড্রাইভারও ঠাট্টা জুড়েছে,—এখন গায়ে নুন ছড়িয়ে খেয়ে ফেললেই হয়।

—যা বলেছেন। তপেশও হাসছে। ঘুরে স্বাতীকে জিজ্ঞেস করল, —মহিলাটি কে? কোনও রিলেটিভ?

—না। জাস্ট পরিচিত।

—তোমাকে বেশ বোর করছিল মনে হল?

উত্তর না দিয়ে আলগা হাসল স্বাতী। মনে মনে অনিতাকে খুব দোষ দিতে পারছে না। এককালের প্রতিবেশী, খানিক কৌতূহল তো থাকবেই। এমন প্রশ্ন তো করেনি, যা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে। অবশ্য এও ঠিক, স্বাতীর বিপদের দিনে এই প্রতিবেশীরাই নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে। স্বাতীর হয়ে মুখ ফুটে দুটো বাক্যও উচ্চারণ করেনি।

—গাড়িতে বসে রেকর্ডিংটা দেখছিলাম, বুঝলে। বহুৎ বাড়তি আছে।

তপেশের স্বরে হালকা ঝাঁকুনি খেল স্বাতী। চোখ খুলে বলল,—তাই বুঝি?

—বুড়োটা তো একই ডায়ালগ চারবার বলেছে। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক বরং অনেক গুছিয়ে বাইট দিচ্ছিল। ওকে আর একটু ফুটেজ খাওয়ালে ভাল হত।

—যাক গে, স্টোরিটা মোটামুটি দাঁড়িয়েছে তো?

—নিশ্চয়ই। তপেশ হা হা হাসল,—যা গলা কাঁপিয়ে পিটিসি করলে!

—নাটুকে শোনাচ্ছে নাকি?

—আরে না, পাবলিক একটু নাটকই খায়। তপেশ মুখভঙ্গি করল, —নিশ্চিন্ত মনে খবরটা এডিট করে নিউজে দিয়ে দাও। আমাকে তো বোধহয় গিয়েই ফের ছুটতে হবে।

—কেন? কোথায়?

—জাহান্নমে। তপেশ কাঁধ ঝাঁকাল,—মেটিয়াবুরুজে একটা বড়সড় আগুন লেগেছে। সুপ্রতিম ক্যামেরা নিয়ে চলে গেছে, আমাকেও বোধহয় যেতে হবে। একটু আগে ফোন এসেছিল। প্রবীরদা জিজ্ঞেস করছিল আমরা এখন কদ্দূর...

—বহুৎ ঝামেলায় পড়লেন। ফায়ার টায়ারের কেস...কখন ছাড়া পান দেখুন।

—হুম্। ফ্যামিলি লাইফটার পুরো বারোটা বেজে যাচ্ছে। রোজই বাড়ি গিয়ে দেখি বউ মুখ ভেটকে আছে। এবার মেয়ে বাবাকে আংকল বলা শুরু করলে ষোলো কলা পূর্ণ হয়।

উদাস মুখে তপেশের আক্ষেপ শুনছিল স্বাতী। পুরুষ সহকর্মীদের এই দুঃখবিলাস তাকে আর ছোঁয় না বড় একটা। মুখে যাই বলুক, বরের কর্মব্যস্ততার অপরাধে কোন বউ তো বরকে ঘেঁটি ধরে বার করে দেয় না বাড়ি থেকে? সে সাহসও নেই, অধিকার তো নেইই। বরং নিজেরা চাকরি করার পরও দু'হাতে সংসার সামলে জীবনটাকে ধন্য মনে করে মেয়েরা। স্বাতী জানে। আর জানে বলে এটাও বোঝে বউদের ওই মিনমিনে তর্জন পুরুষদের একটু আত্মতৃপ্তির গরিমা বাড়ানো ছাড়া কোনও কম্মে লাগে না।

তপেশ থেমেছে। হেডফোন কানে গুঁজে গান শুনছে মোবাইলে। স্বাতী চটপট দুটো জরুরি ফোন সেরে নিল। প্রথমটা প্রতীককে, দু' নম্বরটা বাড়িতে। উত্তরপাড়ার এক কলেজে নিজের দলবল নিয়ে ওয়ার্কশপ করতে গেছে প্রতীক। আজকের মতো কর্মশালা শেষ, ফিরছে, সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ পেরিয়ে গেছে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবে। হোমফ্রন্টও নরমাল। বিকেলে তিতলিকে নিয়ে রাজডাঙা পার্কটায় গিয়েছিল সবিতা, ফিরেছে খানিক আগে। আজ অনেকটা ম্যাগি খেয়েছে তিতলি, দুধ নিয়েও তেমন নকড়া-ছকড়া করেনি।

যাক, শান্তি। অফিসে গিয়ে এখনই কোনও টেনশান করতে হবে না। নিশ্চিন্তে মোবাইল ব্যাগে রাখছিল স্বাতী, হঠাৎ অনিতাকে যে ফের কেন মনে পড়ল! এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে তাতানকেও।

ওমনি বুক টনটন। কতদিন দেখেনি ছেলেটাকে। প্রায় সাড়ে চার মাস। সেই ছাব্বিশে জানুয়ারি দমদম স্টেশনে স্বাতীর হাতে তাতানকে দিয়ে গিয়েছিল গৌতম। মাত্র দু'ঘণ্টার জন্যে। তারপর থেকে গৌতম সমানে লেজে খেলাচ্ছে। কোর্ট অর্ডারের তোয়াক্কা করছে না। প্রতি সপ্তাহে ছেলেকে দেখানো তো দূরস্থান, নানান অছিলায় পার করে দিচ্ছে মাসের পর মাস। স্বাতী যেদিনই তাতানকে আনতে বলে, সেইদিনই কোনও না কোনও কাজ পড়ে যায় গৌতমের। গৌতমের ভাইটি তো এমন কিছু রাজকার্য করে না, দু'ঘণ্টা মোবাইলের দোকানে না বসলে তার ব্যবসা উল্টে যাবে না, স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে পাঠানো যায় তাতানকে। স্বাতী

বলেওছিল, গৌতম আমলই দিল না। ডিভোর্স আজ হয়নি, নয় নয় করে প্রায় পাঁচ বছর, মাঝে কত কিউসেক জল বয়ে গেল গঙ্গা দিয়ে, অথচ এখনও কী নিষ্ঠুর আচরণ করে! আহা রে, ছেলেটার গলা পর্যন্ত শুনতে পায় না স্বাতী। আজ একবার ফোন করবে? সামনেই তাতানের জন্মদিন...

অফিস এসে গেছে। আর কিছু ভাবাভাবির সময় নেই। ক্যাসেটটা নিয়ে স্বাতী পুরল ইনজেস্টে। পুরোটা ডাউনলোড হতে মিনিট পনেরো। তারপর কপি এডিটরের সঙ্গে বসো, ভিডিও এডিটরকে বোঝাও, কেটেছেঁটে রেডি করো নিউজের মাপে...

ঘাড়ে চাপানো দায়িত্বটা চুকিয়ে আবার অর্ধসমাপ্ত কাজটা নিয়ে বসার তোড়জোড় করছিল স্বাতী। হঠাৎই মগজে পিপ্ পিপ্। সামনের সপ্তাহে শুক্রবার ছেলেটার জন্মদিন। গতবছর বিশ্রী একটা ভাইরাল ফিভার হয়েছিল তিতলির, প্রায় কেঁদেকেটে অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিল, গৌতমের সঙ্গে যোগাযোগই করতে পারেনি। খুব অভিমান হয়েছিল বুঝি তাতানের, জন্মদিনে ফোনও ধরেনি। তার আগের বছর তিতলি এত ছোট, বাড়ি থেকে বেরনোর জো ছিল না। তার আগের বছর তো সে কলকাতাতেই ছিল না। বিয়ের পর পরই কাজের চাপে প্রতীকের সঙ্গে কোথাও যাওয়া হয়নি, তাতানের জন্মদিনের সময়টাতে হপ্তাখানেকের ফুরসত মিলল, দু'জনে ঘুরতে গিয়েছিল শিলং। তিন তিনটে জন্মদিনে বাধা পড়েছে, এবার তো তাতানকে ফাঁকি দিলে চলবে না। এ বছর দেখা করতেই হবে। তার আগে জানবে সে কী চায়? দশ বছরে পড়বে তাতান, এখন কী ধরনের জিনিস পছন্দ করবে? ক্রিকেট খেলার সেট? সঙ্গে নতুন জামাকাপড়? ছেলেকে ভাল ডিজিটাল ঘড়ি কিনে দেবে একটা? নাকি মোবাইল? তাতান যতক্ষণ সঙ্গে থাকে, স্বাতীর মোবাইলটা নিয়ে গেমস্ খেলে। তবু...মোবাইল ফোন বোধহয় বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং ঘড়িই...

ভাবতে ভাবতে স্বাতী ফোনটা করেই ফেলল। খড়দার বাড়ির ল্যান্ডলাইনে। বাজছে ফোন। অন্তহীন আহ্বানের মতো।

অবশেষে বন্ধ হয়েছে রিং। গৌতমের মা ফোন তুলেছে।

স্বাতী বিনয়ী স্বরে বলল,—আমি স্বাতী।

—তুমি? হঠাৎ?

হুঁহু, বোঝে না যেন! স্বাতী শান্ত গলাতেই বলল,—কাইন্ডলি তাতানকে একবার দেবেন?

পলকের নৈঃশব্দ্য। পরক্ষণে মহিলার নিস্পৃহ স্বর—তাতান তো বাড়ি নেই।

—কোথায় গেছে?

—পাশের বাড়িতে।

নির্ঘাৎ মিথ্যে বলছে। আগেও একদিন গুলতাপ্পি মেরে তাতানের সঙ্গে স্বাতীকে কথা বলতে দেয়নি মহিলা। তা বলে কাঁউমাউ করে তো লাভ নেই, স্বাতীকে নত থাকতেই হবে।

বিনম্র স্বরে স্বাতী বলল,—প্লিজ যদি একবার ডেকে দ্যান...

—ও এখন আসবে না। খেলা করছে।

—একটু খবর পাঠান না। বলুন মা ডাকছে। ঠিক চলে আসবে।

—হুঁহ, মায়ের জন্য ছেলে যেন মুহ্যমান হয়ে থাকে! তাও যদি সত্যি সত্যি মার ছেলের ওপর দরদ থাকত! মহিলার শ্লেষমাখা স্বর আচমকাই রুক্ষ,—আমি তোমার দাসীবাঁদি নই, ডাকতে পারব না।

—আমার কিন্তু একটা আরজেন্ট দরকার ছিল। পরের শুক্রবার তো তাতানের জন্মদিন...

—তো? মহিলার স্বর এবার রীতিমতো রূঢ়। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, —কেন ঘ্যানঘ্যান করছ? বললাম তো ডাকতে পারব না।

—এটা কিন্তু আপনি ভাল করছেন না। স্বাতী ধৈর্য হারাল। অসহিষ্ণু স্বরে বলল,—তাতানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে না দেওয়ার আপনাদের কোনও রাইটই নেই।

—ওসব রাইট-মাইট অন্য জায়গায় দেখিও। টিভিতে মুখ দেখাও বলে খুব বুলি ছুটছে, অ্যাঁ? ওই মুখ একবার গুয়ে ঘষে দিয়েছিলাম মনে নেই? ফের যদি গলা উঁচিয়ে কথা বলো, জন্মের শোধ ছেলেকে দেখা ঘুচিয়ে দেব। এখনও তুমি উষা সরকারকে চেনোনি, অ্যাঁ।

বলেই ঘটাং করে রেখে দিয়েছে ফোন। স্বাতী হতবাক। এমন একটা অপমানের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কয়েক লহমা তাই ভেবেই পেল না এখন তার কী করা উচিত। অক্ষম একটা ক্ষোভ ডাঙশ মারছে মাথায়। হ্যাঁ, অতীতে গোখুরি একটা করেছে সে। ডিভোর্সের মামলা চলার সময়ে আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল। ওই বোকার হদ্দ শুড্ডা উকিলটাকে না নিয়ে একটা ভাল লইয়ার অ্যাপয়েন্ট করতেই পারত। আইন তো এখন অনেকটাই মেয়েদের পক্ষে, ঠিকভাবে যুক্তি সাজালে তাতান কখনও বেহাত হয়? দোষ তো স্বাতীর নিজের। আইনের সুযোগটা নিতে পারল না। গৌতম যুক্তি দিয়েছিল ছেলের পাঁচ বছর বয়স হয়ে গেছে, চাকুরে মা ছেলেকে সময় দিতে পারবে না, বাবার কাছে দাদু-ঠাকুমা কাকা-কাকির মাঝে ছেলেটা নাকি চমৎকার একটা ফ্যামিলি লাইফ পাবে...। উকিল তাকে বোঝাল ওইসব আরগুমেন্ট ধোপে টিকবে না, আর স্বাতীও কিনা মেনে নিল? বজ্জাত উকিলটা নিশ্চয়ই গৌতমের কাছ থেকেও পয়সা খেয়েছিল।

সে যাই করুক, ছেলেটা তো উকিলের নয়, স্বাতীর। সুতরাং ভুলের সাজা এখন স্বাতীকেই পেতে হবে। ছেলের জন্য স্বাতী যতই দগ্ধে দগ্ধে মরুক, ওই অভব্য মহিলার চোখা চোখা বাক্যবাণ সইতেই হবে।

একটা বড়সড় শ্বাস ফেলল স্বাতী। কাজে আর মন বসছে না। ঘরে বাচ্চা রয়েছে বলে এখন তার ডিউটি আওয়ার্স একটু আলাদা। ছ'টা দু'টোর মর্নিং শিফ্‌টে কদাচিৎ আসতে হয়, নাইট শিফ্‌ট পুরোটাই ছাড়, দুপুর বারোটা থেকে সন্ধে আটটা তার নিয়মিত কাজের সময়। খুব বড় চ্যানেল নয় বলে এই ছাড় সে পেয়েছে। তাছাড়া তার ট্র্যাক রেকর্ড খুব ভাল, ইন্টারভিউ নেওয়ায় তার বেশ খ্যাতি আছে, চ্যানেলের কর্তাব্যক্তিরা সেটাও বুঝি মাথায় রাখে। কিন্তু তা বলে মনোবেদনার অজুহাতে কাজ কোলে বসে থাকাটাও তো দৃষ্টিকটু। স্বাতী সেটা পারে কি?

মাঝারি মাপের হলঘরটায় এখন প্রবল ব্যস্ততা। এই সন্ধেবেলাটাতেই অফিস সবচেয়ে জমজমাট থাকে। টিভি চলছে দেওয়ালে দেওয়ালে, সাব-এডিটরদের কম্পিউটারে আপডেট হচ্ছে খবর, কেউ পাঠাচ্ছে নতুন

স্টোরি, কেউ বা দ্রুতহাতে স্ক্রোল তৈরিতে ব্যস্ত। তারই মাঝে চলছে গল্পগাছা, টুকুস টুকুস মন্তব্য উড়ছে বাতাসে। কোনও রিপোর্টার ফিরল খবর নিয়ে, কেউ বা সংবাদ সংগ্রহে চলল, নিউজ রিডার সেজেগুজে এগোল স্টুডিওর দিকে...

বাথরুম সেরে স্বাতী সংবাদ সংগ্রাহকদের ঘরটায় ফিরল। টেলিফোনে যোগাযোগ শুরু করল সাহিত্যিকদের সঙ্গে। সাক্ষাৎকারের সময় নিচ্ছে। একদিনে যাতে সব ক'টা ইন্টারভিউ নিতে পারে, চেষ্টা করছে সেইমতো। হল না। সময় মেলানো যাচ্ছে না। অন্তত দুটো দিন তো লাগবেই। একজন লেখক ফোন ধরলেন দার্জিলিং থেকে, তিনি তো আরও দিন সাতেকের আগে সমতলে নামবেনই না। তার বদলে আর একজনকে ধরতে হল। ইনি আবার একটু রসেবশে থাকেন, সন্ধের পর ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান না, এঁকে ইন্টারভিউ করতে হবে সকাল দশটার মধ্যে। কী ঝকমারি, স্বাতীর কাজ বাড়ল আর কী।

যাক গে, আজকের মতো ডিউটি শেষ। বেরনোর মুখে প্রবীর মিত্রর ঘর ছুঁয়ে স্বাতী নেমে এল রাস্তায়। পা চালিয়ে পার্ক সার্কাসের মোড়। ফুটপাত বদলে বাসস্টপ।

সুস্থিত হয়ে দাঁড়াতেই আবার ফিরে আসছিল ক্ষোভটা। কী অপমান, কী অপমান! এর কি কোনও প্রতিকার নেই? এ বছরেও কি জন্মদিনে দেখা হবে না তাতানের সঙ্গে?

হঠাৎ কী যে হল স্বাতীর, ঝপ করে বার করেছে মোবাইল ফোন। টিপছে গৌতমের নাম্বার। বাজছে...। যাহ্, কেটে গেল। আবার রিং করল স্বাতী। হ্যাঁ, আবার বাজছে। আবার ছিঁড়ে গেল সংযোগ। ইচ্ছে করে কেটে দিচ্ছে লাইন? তাই হবে। এর আগেও এই ধরনের অভদ্রতা করেছে গৌতম।

নাহ্, আজ আর ছাড়া নেই। স্বাতীর চোয়াল শক্ত হল। গৌতমকে আজ ধরবেই। একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। স্বাতীকে দুব্‌লা ভেবে মা ছেলে দু'জনে যেভাবে পারে রগড়াবে, এটি আর হচ্ছে না।

অবশেষে সপ্তম বারে সাড়া মিলল গৌতমের। বিরক্ত গলায় বলল, —কী ব্যাপার? বারবার জ্বালাচ্ছ কেন?

স্বাতী তেজী গলায় বলল,—দরকার আছে নিশ্চয়ই।

—আমি এখন ব্যস্ত। অফিসে অনেক ক্লায়েন্ট।

—আমিও কিছু অকর্মা নই। তবে ফোন যখন করছি, প্রয়োজনটা অবশ্যই জরুরি।

—বলো।

—তোমার মা আজও আমায় ইনসাল্ট করলেন। তাতানের সঙ্গে কথা বলতে দিলেন না।

—তুমি চাইলেই তো তাতানকে ধরে দেওয়া যাবে না। আমাদের সময়-অসময় বুঝে তবে ফোন করতে হবে।

—ও। মা ছেলেতে বাতচিত হয়ে গেছে? স্বাতী খানিকটা বাতাস ভরল ফুসফুসে। স্পষ্ট উচ্চারণে বলল,—কোর্ট কিন্তু ছেলের সঙ্গে কথা বলার সময়-অসময় নির্দেশ করে দেয়নি।

—কোর্টে ফের কমপ্লেন করো। জজসাহেব যদি হুকুম দেন, রাত দু'টোয় ছেলেকে ফোন ধরতে দেব।

জ্বলে উঠতে গিয়েও নিভে গেল স্বাতী। নাহ্, এভাবে কব্জা করা যাবে না। একটু সময় নিয়ে গলা ঈষৎ নরম করে বলল,—বুঝেছি। বল যখন তোমাদের কোর্টে, তোমাদের ইচ্ছেই মানতে হবে।...তা নেক্সট উইকে তাতানের জন্মদিন, ওইদিন ছেলেকে একটু দেখতে পাব কি?

—আশ্চর্য! তাতানের বার্থডে তোমার মনে আছে?

হুলটা যথাস্থানে বিঁধেছে। তবে রক্ত ঝরতে দিল না স্বাতী। কেজো গলায় বলল,—জন্মটা যখন আমিই দিয়েছি, তখন মনে না থাকার তো কোনও কারণ নেই।

—আহা, তাতানের কী অসীম সৌভাগ্য! দিনটা তোমার খেয়ালে আছে। যদিও গত তিন বছর দিব্যি ভুলে ছিলে।

—আমি কিন্তু একটা প্রশ্ন করেছি। গৌতমকে আর এগোতে দিল না স্বাতী। গোমড়া গলায় বলল,—আমি তাতানকে ওই দিন একবার মিট করতে চাই।

—বটে? কয়েক সেকেন্ড কোনও সাড়াশব্দ নেই। ফের স্বর ফুটেছে

গৌতমের,—কিন্তু ওইদিন তো তাতানকে নিয়ে বেরোতে পারব না। জন্মদিনের পার্টি আছে।

—তাহলে কি এবারেও...?

—ভেবে দ্যাখো কী করবে।...ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। তোমার এল.আই.সি. প্রিমিয়ামের নোটিস আবার আমাদের বাড়িতে এসেছে। জানো এটা তোমার অ্যাড্রেস নয়, এখনও কেন বদলাওনি?

—সরি। কালই এল.আই.সি. অফিসে চিঠি দিচ্ছি।

—দয়া করে দাও। ভুল ঠিকানায় আর যেন কোনও চিঠিপত্র না আসে।

হ্যাঁ, ভুল ঠিকানা তো বটেই। মিশনপল্লির ওই বাড়িটা কি কোনও কালেই স্বাতীর সঠিক অ্যাড্রেস ছিল? বউ হওয়ার সুবাদে যদি কোনও অধিকারই থাকত, তাহলে কি ওভাবে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়?

গৌতম ফোন কেটে দিয়েছে। স্বাতী ফোঁস করে আবার একটা শ্বাস ফেলল। তার ইচ্ছেটাকে প্রায় এককথায় খারিজ করে দিল গৌতম। সন্ধেটা আরও তেতো হয়ে গেল স্বাতীর, বড্ড অবসন্ন লাগছে। জ্যৈষ্ঠের বাতাসে দিনের হলকা নেই আর, বরং হাওয়াতে একটা নরম স্নিগ্ধতা, স্বাতী তবু স্বস্তি পাচ্ছিল না। কী যে সে করে এখন?

বাসে এখনও গাদাগাদি ভিড়। গুঁতোগুঁতি করে উঠতে ইচ্ছে করছে না, ট্যাক্সি ধরে নিল স্বাতী। সরাসরি রাজডাঙার ফ্ল্যাটবাড়ির গেটে এসে নেমেছে। বাড়ি ঢুকে এখন শরীরটা ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচে।

স্বাতীদের ফ্ল্যাট চারতলায়। পায়ে পায়ে লিফটের সামনেটায় এসে স্বাতী থমকাল। আউট অফ অর্ডার বোর্ড ঝুলছে।

এখন সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠতে হবে? স্বাতীর ঠোঁটে একটা মলিন হাসি ফুটে উঠল। এক-একটা দিন ভাগ্য যে কেন এত নিষ্করুণ হয়!

দুই

তিতলিকে ঘুম পাড়াচ্ছিল প্রতীক। কাজটা নেহাত সোজা নয়। রাতে বাবা-মাকে একসঙ্গে পেয়ে তিতলির আহ্লাদের লাগাম থাকে না। তিড়িংবিড়িং লাফায়, ছোটে, কথা বলে টকর টকর। তখন তাকে শোওয়ানো যা দুঃসাধ্য। খাইয়েদাইয়ে যাও বা চেপেচুপে বিছানায় পেড়ে ফেলা হল, কিছুতেই চোখ বোজে না মেয়ে। তখন অবিরাম তাকে গল্প শোনাও, সঙ্গে পিঠেঘাড়ে সুড়সুড়ি তো চাইই চাই।

সেই কাজগুলোই সুচারুভাবে করে চলেছিল প্রতীক। মুখ চলছে, সঙ্গে সঙ্গে আঙুলও। সে নিপুণভাবে পারে এসব। করতে ভালওবাসে। স্বাতীর মতো সে অধৈর্য নয়। বড়জোর মিনিট পাঁচেক মেয়ের পিঠ থাবড়াবে স্বাতী, তারপর হাত উঠে যায় চটাস চটাস। কেন যে মেয়েটার গায়ে হাত তোলে স্বাতী? কেন যে শোনায়, তাতানকে নিয়ে তার কোনও হ্যাঙ্গামা ছিল না, দু'বার চাপড়ালেই নাকি সে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যেত? স্বাতী যে কেন তুলনা করে?

দরজায় গলা খাঁকারির আওয়াজ। ঘাড় হেলিয়ে তাকাল প্রতীক। খাবার গরম করে টেবিল সাজিয়ে স্বাতী সিগনাল দিচ্ছে। চোখ আর হাতের ইশারায় প্রতীক জবাব দিল, মোটামুটি মেরে এনেছি, তুমি যাও, আমি আসছি।

স্বাতী সরে গেল। মুখখানা কেমন গোমড়া হয়ে আছে স্বাতীর। এখনও। অফিস থেকে ফিরে তো প্রায় কথাই বলছে না। অফিসে কোনও সমস্যা হয়েছে ভেবে খোঁচাখুঁচি করতে চায়নি প্রতীক। অকারণ কৌতূহলে কাউকে বিব্রত করা তার ধাতেই নেই। তাই এটা-সেটা হালকা রসিকতা জুড়ে স্বাতীকে ক্রমশ স্বাভাবিক করতে চাইছিল। উত্তরপাড়া কলেজে হঠাৎ প্রোজেক্টার খারাপ হয়ে কী বিভ্রাট ঘটেছিল আজ, ওয়ার্কশপে ছাত্রছাত্রীদের হার কম বলে কীভাবে বার বার সরি বলছিলেন প্রিন্সিপাল, শোনাচ্ছিল মজা করে করে। তখন কি ছাই প্রতীক আন্দাজ করতে পেরেছিল ঠিক কী ঘটেছে? ছি ছি, গৌতম লোকটা এমন ইতর? তার মা'টাই বা কী? নিজে মহিলা হয়ে আর একটা মেয়ের মন বুঝবে না? গোটা ঘটনাটা উগরে দিতে গিয়ে স্বাতী তো প্রায় কেঁদেই ফেলছিল!

স্বাতী এখনও ব্যাপারটা সামলে উঠতে পারেনি। স্বাভাবিক, পেটের ছেলে বলে কথা। ছেলের ওপর স্বাতীর দুর্বলতা যে কমেনি এতটুকু, তাও তো প্রতীক জানে।

তিতলির চোখ পিটপিট বন্ধ হয়েছে। মেয়ের রেশম রেশম চুলে আঙুল বোলাতে বোলাতে প্রতীক একটুক্ষণ নিরীক্ষণ করল মেয়েকে। তারপর বিছানা ছেড়েছে। ডাইনিং টেবিলে এসে বসল।

স্বাতী রান্নাঘরে। প্রতীক সামান্য গলা ওঠাল,—কী গো? এসো।

—এক সেকেন্ড। আম দুটো কেটে নিই।

—এহ্, তুমি কেন? ওটা তো আমার ডিপার্টমেন্ট।

—হয়ে গেছে। বলতে বলতে আমের প্লেট হাতে ফিরল স্বাতী। চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল,—আজ কিন্তু আইটেম বেশি নেই। মুরগির ঝোল আর আলু-পটলের চচ্চড়ি।

বড্ড নিষ্প্রাণ শোনাচ্ছে স্বাতীর গলাটা। পরিবেশ স্বাভাবিক করতে প্রতীক স্বরে কৌতুক মেশাল,—কিঁউ ম্যাডাম? কালকের কুমড়ো ভি তো মজুত হ্যায়। প্লাস, সুইট সুইট হিমসাগর।

স্বাতী ক্যাসারোল খুলল,—ক'টা রুটি দেব?

—তিনটেই কাফি। পরে লাগলে না হয়...

আহারের ব্যাপারে প্রতীকের কোনও কালেই তেমন একটা উৎসাহ নেই। স্রেফ পেট ভরানো নিয়ে তো কথা। আর এ বাড়িতে রান্নাবান্না একটু কম কমই হয়। গুছিয়ে রাঁধার সময় কোথায় স্বাতীর, যা তাড়াহুড়ো থাকে সকালের দিকটায়। তাও তো করে স্বাতী। বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ডে-অফের দিন দু'চারটে অন্যরকম পদ বানায়।

রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে দরকারি কথাটা মনে পড়ে গেল প্রতীকের। বলল,—ও হ্যাঁ, তোমাকে তো জানানো হয়নি। তোমার সবিতারানি তো আজ একপ্রস্থ গান গেয়ে গেলেন।

স্বাতীর চোখ তেরচা,—আবার ছুটি চায় বুঝি?

—নাহ্। অভাবের ক্যাসেটটা বাজাচ্ছিল।

—কীরকম?

—লাস্ট বড় কালবৈশাখীটায় ওর নাকি চালের কয়েকটা টালি খসে গেছে। এবার বর্ষায় খুব আতান্তর হবে।

—শুনেছি তো।...অ্যাডভান্সের ধান্দা করছে?

—হতে পারে। তবে আমার ধারণা, মাইনে বাড়াতে বলছে।

—কই, আমাকে তো সেসব বলেনি?

—সাহসে কুলোয়নি বোধহয়। তোমাকে যা ভয় পায়! প্রতীক মুচকি হাসল,—কিংবা আমাকেই মুরুব্বি ঠাউরেছে।

—ও। স্বাতী নিজের প্লেটে আলু-পটল নিল,—কিছু কমিট করোনি তো?

—খেপেছ? তোমার পারমিশান না নিয়ে পয়সাকড়ির ব্যাপারে নাক গলাই!

—এক্ষুনি ওর আবদার মানা যাবে না। কম টাকা দেওয়া হয় নাকি

ওকে? মাত্র দু'বছর আগে আড়াই হাজারে ঢুকেছিল, এখন সেটা চারে দাঁড়িয়েছে।

স্বাতীর কথাটা পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত মনে হল না প্রতীকের। তবু সরাসরি তর্কে না গিয়ে আলগাভাবে মন্তব্য ভাসাল,—ওকে শুধু তিতলির দেখাশোনার জন্য রাখা হয়েছিল স্বাতী। এখন কিন্তু ও অনেক বাড়তি কাজও করে।

—কী করে? স্বাতীর গলায় পলকা ঝাঁঝ,—সকালবেলা আমায় একটু হাতে হাতে এগিয়ে দেয়, আর রাতের রুটিটা বানায়। এইটুকুনি তো।

—কাজ কিন্তু নেহাত তুচ্ছ নয়। যথেষ্ট জরুরি। মনে মনে আর্গুমেন্টের পয়েন্টগুলো দ্রুত সাজিয়ে নিল প্রতীক। অভ্যস্ত শান্ত স্বরেই বলল, —সবিতার শিডিউল ডিউটি টাইম সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা। মাঝে মাঝে আমাদের দু'জনেরই ফিরতে দেরি হয়, তখন ও আরও এক-আধ ঘণ্টা থেকে যায়। তারজন্য আমরা এক্সট্রা কিছু দিই কি?

—সে তো ক্বচিৎ কখনও। তাছাড়া ওকে ওভারটাইম দেওয়ার তো কথা ছিলই না।

—মে বি। তবে দিই না, এটাই ফ্যাক্ট।...তারপর ধরো, মেয়েটা যথেষ্ট বিশ্বাসী, তিতলির ওপর খুব টানও আছে...। ওর ওপর ভরসা করেই তো আমরা যে যার কাজ করছি। এতে ওয়ার্কিং প্লেসে আমাদের অনেক সুবিধে হচ্ছে...

—কীভাবে?

—বা রে, আমরা একটা মানসিক স্থিতি তো পাচ্ছি। যেটা আমাদের কর্মক্ষেত্রে সাকসেসের একটা ভাইটাল স্টেপ। সবিতার হয়ে আমি প্লিড করছি না, তবে এর একটা নগদ বিনিময়মূল্য কিন্তু ওর হকের পাওনা।

—তোমার ইকনমিক্স বুঝি তাই বলে?

শ্লেষটা গায়ে মাখল না প্রতীক। এখন সে পরিবেশ নিয়ে কাজ করে বটে, কিন্তু অর্থনীতি তার সাবজেক্ট, স্বাতী তা মাঝে মাঝেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কখনওবা একটু বাঁকা সুরে। তবে চারপাশের জগৎটাকে তো প্রতীক শুধু অর্থনীতি নয়, বরং যুক্তি আর মানবিকতার চোখ দিয়েই দেখে বেশি।

প্রতীক এখন অবশ্য অর্থনীতির দিকেই ঝুঁকল। মুরগির ঝোলে রুটি ডুবিয়ে মুখে পুরে বলল,—একটু ভাবো তো ওর মাসিক মাইনে কত? চার হাজার। তিরিশ দিয়ে ভাগ করলে দিনে একশো তেত্রিশ টাকা সামথিং। অ্যামাউন্টটা কি আজকের দিনে খুব বেশি?

—খুব একটা কমও নয়। সরকারের মিনিমাম ওয়েজের কাছাকাছি।

—কিন্তু ওর ইউটিলিটিটা ভাবো। আমাদেরকে সবিতার বেশি প্রয়োজন? নাকি সবিতাকে আমাদের বেশি দরকার? ওকে ছেড়ে দিলে ও আমাদের মতো একটা ফ্যামিলি পেয়ে যাবে, আমরা খুব সহজে আর একটা ঠিকঠাক সবিতা পাব কি? পারস্পরিক প্রয়োজনের এই ফ্যাক্টরটাও...

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা। তাই হবে। মাইনে বাড়িয়েই দেব। খুশি?

—উঁহু। প্রতীক মিটিমিটি হাসছে। এভাবেই না ধাপে ধাপে মূল পয়েন্টে আসতে হয়। এক ঢোক জল খেয়ে প্রতীক বলল,—মাইনে বাড়ানো তো একটা স্টপগ্যাপ অ্যারেঞ্জমেন্ট। পার্মানেন্ট সল্যুশান নয়।

স্বাতী মাথা নামিয়ে খাচ্ছিল। চোখ তুলে বলল—সল্যুশানটা তাহলে কী?

—আমাদের সিচুয়েশানটা একটু তলিয়ে ভাবার চেষ্টা করো। তোমার ডিউটি আওয়ার্স কি চিরকালই বারোটা-আটটা থাকবে? যদি বা থাকেও, তুমি কি গ্যারান্টি করতে পারো, অফিস তোমায় অন্য কোনও সময়ে এত্তেলা পাঠাবে না? ইন ফ্যাক্ট, পাঠায়ও তো। এই তো গত মঙ্গলবার সক্কালবেলা তোমায় বরানগর দৌড়তে হল। ভাগ্যিস আমার সেদিন বেরনোর তাড়া ছিল না। কিন্তু এই পরিস্থিতি তো সবসময়ে পাওয়া যাবে না। তারপর ধরো, আমিও তো মাঝে মাঝে হুটহাট বেরিয়ে যাই। দু-পাঁচ-সাত দিন ফিরতে পারি না। ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের ওপর ডকু ফিল্মটা করার সময়ে টানা আট দিন আমি বাড়ি ফিরিনি, মনে আছে? জাস্ট থিংক, সবিতা যদি তখন একদিনও কামাই করত...

—আহ্, এসব প্রবলেম নিয়ে তো আমরা আগেও ডিসকাস করেছি। স্বাতীকে বেশ অসহিষ্ণু দেখাল,—আর তো ক'টা মাস। এরপর তো তিতলি প্লেহোমে যাবে। এমন প্লেহোম যেখানে ক্রেশ আছে।

—ব্যস, তাতে বুঝি সব মিটে যাবে? প্রতীক আর একখানা রুটি নিল, —আমি অনেকগুলো জায়গায় খোঁজ করেছি। নেটও ঘাঁটলাম। বাইপাসে একটা ইনস্টিটিউশান আমার বেশ মনেও ধরেছে। ক্রেশ প্লেহোম তো বটেই, দিল্লি বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশানও আছে স্কুলটার। একটু হয়তো কস্টলি, তবে আমরা দু'জনে মিলে বোধহয় অ্যাফোর্ড করতে পারব।

—ভালই তো। ওখানেই তবে তিতলিকে ভর্তি করা হোক।

—কিন্তু আমাদের অসুবিধেটা যে থেকেই যাচ্ছে স্বাতী।

—কেন?

—কোনও ক্রেশে সাড়ে ছ'টার পর বাচ্চা রাখে না। তুমিই তো একদিন গল্প করেছিলে তোমাদের অফিসের মেঘনা শুধু এই কারণেই বাচ্চাকে ক্রেশে দিতে পারেনি। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য লোক রেখেছে। সেই মহিলা নাকি খুব কাজের! মেঘনার সংসারটাকে দু'হাতে সামলায়! কিন্তু আমরা চাইলেই কি তেমনটা মিলবে?

—হুম্। স্বাতী মাথা দোলাল,—তাতানের বেলায় এই প্রবলেমটা ছিল না। বাড়িভর্তি লোক, দাদু ঠাকুমা কাকা কাকিমা...

বাক্য অর্ধসমাপ্ত রেখে স্বাতী থেমে গেল সহসা। কথাটা প্রতীকের কানেও ঠক করে বেজেছে। কেন যে তিতলির প্রসঙ্গ উঠলেই স্বাতী তাতানে ঢুকে পড়ে?

একটু যেন তাল কেটে গেছে পরিবেশটায়। আমের একটা আঁটি তুলল প্রতীক। চুষছে। অপাঙ্গে দেখছে স্বাতীকে। বুঝি প্রতীকের দৃষ্টিটাই স্বাতীকে ফের সরব করল। শুকনো শুকনো গলায় বলল,—তাহলে আমাদের এখন কী করা উচিত?

প্রতীক যেন এই প্রশ্নটারই অপেক্ষায় ছিল। মৃদুস্বরে বলল,—বলতে পারি, যদি অভয় দাও।

—কী?

—সবিতা যেমন আছে থাক। অন্যভাবে নিও না...যদি তোমার মাকে আমাদের সঙ্গে এসে থাকতে বলি...

—মা?

—হ্যাঁ। যদি অবশ্য ওঁর কোনও আপত্তি না থাকে। আমার মা-বাবা তো মরে গেলেও শিলিগুড়ির বাড়ি ছেড়ে নড়বেন না...উনি যদি রাজি হন...। তাহলে আমরাও মাথার ওপর একজন গার্জেন পাই, আর ওঁরও নিশ্চয়ই নাতনিকে নিয়ে ভালই সময় কাটবে। প্রতীক মুখখানা হাসি হাসি করল,—আমাদের জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন তো পরশু। মানে বৃহস্পতিবার। ওদিন যদি প্রসঙ্গটা তোলো...

—না না, তা হয় না। স্বাতী এক ঝটকায় খারিজ করে দিল প্রসঙ্গটা, —মাকে এখানে রাখা সম্ভব নয়।

—কেন?

—কেন আবার কী। বেশ তো আছি আমরা। গার্জেন ফার্জেন দিয়ে কী হবে? স্বাতীর স্বর দুম করে চড়ে গেল। চেয়ার ঠেলে উঠতে উঠতে বলল, —কারওর ওপর ডিপেন্ড করতে হবে না। তেমন হলে আর একটা আয়া রাখব। ক'টা টাকা না হয় বেশিই খরচা হবে।

—আহা, উত্তেজিত হচ্ছ কেন?

—তুমি উত্তেজিত করছ, তাই। অবান্তর কথা বলছ, তাই। আমাকে চটিয়ে মজা পাচ্ছ, তাই।

কী এমন গর্হিত প্রস্তাব দিয়েছিল প্রতীক? স্বাতীর যে কী হয় মাঝে মাঝে! অকারণে এমন খেপে যায়! মাথাটা আজ গরম আছে বলেই কি...? যাক গে, এখন আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই, পরশু নয় দেখা যাবে।

আহার শেষ করে বেসিনে আঁচাল প্রতীক। বেশ খানিকক্ষণ ধরে কুলকুচি করল। তারপর ঘরে এসেছে। ল্যাপটপ খুলে বসল কাজে। জলে আর্সেনিক দূষণের ওপর একটা ডকুমেন্টারি করার বরাত পেয়েছে, চলছে এখন চিত্রনাট্য রচনা। ডকু ফিচার ধরনের করার ইচ্ছে। তবে সরকারি কাজ তো, বাজেট তেমন বেশি নয়, তাই সংযত করতে হচ্ছে সাধটা। তথ্য পরিসংখ্যানের ওপর জোর দিতে হবে বেশি, যেমনটা গভর্নমেন্ট চায়। নদীয়ার তিন-চারখানা গ্রাম ধরে বানাবে ছবিটা। সামনের সপ্তাহে এক-দু'দিন যেতেও হবে নদিয়ায়, সরেজমিন করে আসতে হবে সাইটগুলো। তা সে পরের ভাবনা পরে, আগে লেখার কাজটা তো শেষ হোক।

একবার কাজে ডুবলে প্রতীকের আর সময়ের হুঁশ থাকে না। হঠাৎই খেয়াল হল রাত অনেকটা গড়িয়ে গেছে। সময়টা দেখে চমকে উঠল। পৌনে একটা। স্বাতী কোথায়? এখনও শুতে আসেনি যে বড়?

ল্যাপটপ বন্ধ করে উঠল প্রতীক। ছোট্ট একটা আড়মোড়া ভেঙে একবার নিদ্রিত তিতলিকে দেখল। তারপর পায়ে পায়ে ছোট্ট ড্রয়িংহলে।

কী কাণ্ড! স্বাতী টিভি চালিয়ে বসে আছে সোফায়! এত রাতে... স্পোর্টস চ্যানেল...?

প্রতীক ফ্রিজ খুলে একটা জলের বোতল বার করল। ঢকঢক ঢালল গলায়। বোতল হাতেই এগিয়ে এল স্বাতীর পানে। সামান্য তরল গলায় বলল,—ব্যাপারখানা কী? তুমি এফ. এ. কাপ দেখছ যে বড়?

স্বাতী খুব একটা চমকাল না। আলগাভাবে বলল,—এমনিই। চালিয়ে বসে আছি।

প্রতীক সোফায় এল। স্বাতীর পাশে। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল,—মাথা এখনও ঠাণ্ডা হল না?

—মাথা আমার ঠাণ্ডাই আছে।

—বললে মানব? স্বাতীর কাঁধে হাত রাখল প্রতীক। মৃদু চাপ দিয়ে বলল,—কী ভাবছ আমায় বলো না।

স্বাতী যেন এবার একটু নাড়া খেয়েছে। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, —আমার আর ভাল লাগছে না প্রতীক। কিছু ভাল লাগছে না।

—জানি। বুঝি তো। জন্মদিনে ছেলেকে দেখতে পাবে না, এটা তো সত্যিই খুব শকিং। ওরা যে তোমায় কষ্ট দেওয়ার জন্য তোমার ইচ্ছেটা উড়িয়ে দিল, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। স্বাতীকে আর একটু কাছে টানল প্রতীক। গাঢ় স্বরে বলল,—কিন্তু তখন আমি তোমাকে অতবার করে কী বোঝালাম? যে ঘটনার ওপর তোমার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, তা নিয়ে ভেঙে পড়াটাও তোমার সাজে না।

—কিন্তু এখনও আমাকে আঘাত দিয়ে ওদের কী লাভ? একটা বিশেষ দিনে ছেলেকে একবারটি দেখতে চাইছি, এটা মেনে নিতে গৌতমের কী ক্ষতি?

কী ছেলেমানুষের মতো ভাবনা! লাভ-ক্ষতির হিসেব কি ওভাবে হয়? গৌতমকে প্রতীক চেনে না। কক্ষনো চাক্ষুষ দেখেওনি। তবে স্বাতীর মুখ থেকে যেটুকু অতীত কাহিনি শুনেছে, তাতে তো মনে হয় সেই লোকটির পক্ষে এই ধরনের আচরণই স্বাভাবিক। শুধু গৌতম কেন, গড়পড়তা যে কোনও তথাকথিত দাপুটে পুরুষই প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে বোধহয় এই ব্যবহারই করে। আরে বাবা, সে তো স্বাতীকে জব্দই করতে চেয়েছিল। ধরেই নিয়েছিল স্বাতীর জীবনটা সে ছারখার করে দিতে পেরেছে। স্বাতী তাকে কাঁচকলা দেখিয়ে ফের বিয়ে করল, বউবাচ্চা নিয়ে দিব্যি ঘরসংসার করছে, এতে সে না চটে পারে? এখন তো সে সুযোগ পেলেই যাঁতা দেবে স্বাতীকে। ছেলেকে দাবার বোড়ে হিসেবে পেয়ে গেছে, এমন সুযোগটা তো গৌতম নামের অভব্য লোকটা নেবেই। স্বাতী তো যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, এই সরল সত্যটা যে কেন বোঝে না? নাকি ছেলের ওপর এত বেশি টান, যে বুঝেও বুঝতে চায় না? নতুন সংসার পেতে বসেছে, তিতলির মতো একটা ফুটফুটে মেয়ে পেয়েছে, তবুও...।

ভাবলেই একটা চোরা খচখচানি। প্রতীক তবু বলল,—তুমি বরং একটা কায়দা করতে পার স্বাতী। ছেলের বার্থডে নিয়ে হল্লাগুল্লা না করে গৌতমবাবুকে বলো আগের দিন ছেলেকে দেখাতে। সেদিন বৃহস্পতিবার, তোমার ছুটি, নিশ্চিন্ত মনে যাও, ছেলেকে বেশিক্ষণ কাছে রাখো...

—হুঁহ, আমি চাইলেই যদি সব হত। চিজ আমি চিনে গেছি। নির্ঘাত সেদিনও কোনও একটা ফ্যাকড়া তুলে তাতানকে আনবে না। স্বাতীর গলায় ক্ষোভ ঝরে পড়ল,—আশ্চর্য, ন'-ন'টা মাস তাতানকে যে পেটে ধরে রাখল, তার ইচ্ছেটা ফালতু? বছরকার দিনে ছেলেকে একবার দেখতে চাইলেও মুখে ঝামা ঘষে দেবে? ইতরামিরও তো একটা সীমা থাকে।

—বি র‍্যাশনাল স্বাতী। প্রতীক না বলে পারল না,—তুমি একটা পার্টিকুলার দিন নিয়ে এত হা-হুতাশ করছ কেন? ভুলে যেও না, গত তিনটে বছর তুমি কিন্তু জন্মদিনে ছেলেকে দেখতে চাওনি।

—বাজে কথা। বলো, যেতে পারনি। তার কারণও ছিল। ওই দিনটাতে আমি কত ছটফট করি তাও তুমি দেখেছ। ও বাড়ি থেকে যখন

আমায় তাড়িয়ে দিল, তার পর পরই জন্মদিন ছিল তাতানের। ওই কুৎসিত সিচুয়েশানেও আমি কিন্তু ছেলেকে ফোন করেছিলাম। গৌতম সেদিনও তার স্বরূপ দেখিয়েছিল। আমায় তাতানের সঙ্গে কথা বলতে দেয়নি।

—ও-কে। ও-কে। মানছি দিনটা নিয়ে তুমি খুব কনসার্নড। কিন্তু এটাও তো ফ্যাক্ট, পর পর তিনটে বছর ছেলেকে না দেখে দিনটা তোমার কেটেছে। ফর সাম রিজন অফ ইওর ওউন। ধরে নাও এবারও সেরকম কোনও একটা কারণে...। জাস্ট একটা দিনের তো ব্যাপার।

—আশ্চর্য, এমনভাবে বলছ যেন বছরের বাকি দিনগুলোতে আমি টুসকি বাজালেই গৌতম ছেলে নিয়ে নাচতে নাচতে চলে আসে! স্বাতী প্রায় ফেটে পড়ল,—কী অর্ডার দিয়েছিল কোর্ট, অ্যাঁ? মা প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত একবার ছেলেকে কাছে পাবে। সে তোয়াক্কা করেছে ওই অর্ডারের? সপ্তাহ তো ছার, মাসের পর মাস কেটে যায়...

—তোমার এই গ্রিভান্সটা খুবই লেজিটিমেট। কিন্তু সে যদি না মানে...

—তাকে মানাতে হবে। একটা কিছু এবার করতেই হবে আমাকে। আমার তাতান পাকাপাকি বেদখল হয়ে যাবে, এ আমি হজম করব না।

—কী করবে? কী করার আছে?

—এনিথিং। এনি ড্যাম থিং আই শ্যাল ট্রাই। স্বাতী দাঁতে দাঁত চাপল, —আবার আমি কোর্টে যাব।

স্বাতীর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? প্রতীক অস্ফুটে বলল,—ফের আইন-আদালতের ঝঞ্ঝাটে ঢুকবে? তোমার এত কাজের চাপ...সংসার...সব সামলে-টামলে...

—তুমি তো আছ পাশে। আমায় সাহায্য করবে। প্রতীকের হাতে হাত রাখল স্বাতী,—করবে না...আমার মিস্টার ডিপেন্ডেবল্?

প্রতীক হাসল একটু। মেজাজ হঠাৎই কেমন কষটে মেরে গেছে, তবুও। মাথাও বুঝি নাড়ল ছোট্ট করে। কেন যে নাড়ল! উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—চলো, শোবে তো?

স্বাতী ঢুকেছে ঘরের লাগোয়া বাথরুমে। ঘুমন্ত তিতলির পাশে গড়িয়ে পড়ল প্রতীক। আলো জ্বলছে, এক হাতে চোখ ঢাকল আড়াআড়ি, অন্য হাত

ছুঁয়ে আছে মেয়েকে। টের পেল, স্বাতী বেরিয়েছে বাথরুম থেকে। বসেছে বিছানায়।

প্রতীক চোখ থেকে হাত সরাল। তখনই ধক করে উঠল বুকটা। স্বাতী যেন কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে! ভারী নরম মায়াময় চাহনি। যেন নির্ভরতা চাইছে। শীতল ছায়া খুঁজছে।

ফ্যাসফেসে গলায় প্রতীক বলল,—কী দেখছ?

—তোমাকে।

—বললাম তো আমি তোমার পাশে আছি। আর জেগো না, শুয়ে পড়ো।

আলো নিভে গেল। আহ্, অন্ধকারেই স্বস্তি। কিন্তু এক্ষুনি ঘুম আসবে কি প্রতীকের?

তিন

আজকাল বাপের বাড়ি যাওয়ার নামে গায়ে জ্বর আসে স্বাতীর। রাজডাঙার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে রিকশায় বাইপাস কানেক্টার, অটো ধরে বালিগঞ্জ স্টেশন, ওভারব্রিজ টপকে ট্রেনে চাপো, শেয়ালদা গিয়ে আবার ট্রেনে গুঁতোগুঁতি করে দমদম, ফের রিকশা ধরে পূর্ব সিঁথির বাড়িটা। পৌঁছতে পৌঁছতে দম নিঃশেষ। তিতলি ট্যাঁকে থাকলে তো আরও ঝকমারি। বেচারা মেয়েটা এত ধকল নিতেই পারে না। কত যে আলটপকা বায়না জোড়ে পথে। না মেটালেই ঠোঁট ফুলবে, গিয়ে নালিশ করবে দিম্মাকে...। মাত্র দু'বছরেই এমন কথার জাহাজ হয়েছে মেয়ে।

আজ অবশ্য স্বাতী অত হ্যাপায় গেল না। ঘরের দরজা থেকে কপাল জোরে ট্যাক্সি জুটেছিল। তুরন্ত কালীঘাটে এসে মেট্রো ধরে সোজা দমদম। বাপের বাড়ির সামনে যখন রিকশা থেকে নামল, তখনও বিকেলটা ফুরোয়নি।

বেল বাজাতেই গ্রিল-দরজায় মণিকা। তালা খুলতে খুলতে একগাল হাসল,—এত দেরি করলে কেন?

স্বাতী হালকা গলায় বলল,—সপ্তাহে ছ'টা দিন যা নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরতে হয়, আজ একটু আলসেমি করব না?

—তোমার বর কিন্তু এসে গেছে। জমিয়ে আড্ডা মারছে আমাদের সঙ্গে।

—ওমা, তাই? স্বাতীর মুখে পলকা বিস্ময়,—দুপুরে কথা হল প্রতীকের সঙ্গে, বলল যেতে যেতে ওর নাকি সন্ধে হয়ে যাবে!

—তোমাকে বিট মেরে দিল তো? মণিকা খিলখিল হাসছে,—চলো চলো, ভেতরে চলো।

বারান্দায় চটি খুলতে খুলতে স্বাতী বলল,—দাদাও ফিরে এসেছে?

—নাহ্। তার ফিরতে ফিরতে সাড়ে সাতটা-আটটা। আজ অবশ্য একটু তাড়াতাড়িও আসতে পারে। বলতে বলতে মণিকার চোখ তিতলিতে, —ওমা, মেয়েটা কী মিষ্টি হচ্ছে গো দিন দিন। দেখলেই মনে হয় কপাৎ করে খেয়ে নিই।

প্রস্তাবটা মোটেই মনঃপূত হয়নি তিতলির। একটু যেন কুঁকড়ে গেল। মার পিছু পিছু ঢুকল অন্দরে। বাবাকে দেখতে পেয়ে বুঝি তার বুকে বল এসেছে। এক দৌড়ে সোজা প্রতীকের কোলে।

স্বাতীর বাপের বাড়িটা তেমন বড় নয়। মোট দু' কাঠার মতো জমি। আগে একতলাই ছিল, হালে দোতলায় একটা ঘর তুলেছে স্বপন, বাথরুমসহ। মণিকা আর স্বপন এখন ওপরেই থাকে। নীচে তিনখানা ঘর। বড়ঘরটি সরমার, মাঝারিটায় থাকে তার সাড়ে আট বছরের নাতি পাপু, ছোটঘরখানা এখন এ বাড়ির স্টাডিরুম কাম লাইব্রেরি কাম ডাম্পিং গ্রাউন্ড। রান্নাঘরের সামনে খাবার টেবিল ফেলে ডাইনিং স্পেস ছাড়াও একফালি জায়গা আছে ফাঁকা মতোন। ওখানেই ছোট সোফা সেট রেখে বানানো হয়েছে এ বাড়ির বসার ঘর।

প্রতীক সেই বসার ঘরেই বিরাজমান। সামনে সরমা। হাত বাড়িয়ে সরমা ডাকল নাতনিকে। নড়ল না তিতলি, বাবাকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে। এ বাড়ি তিতলির মোটেই অচেনা নয়, কিন্তু প্রতিবারই ধাতস্থ হতে তার খানিক সময় লাগে।

সরমা ঠাট্টা জুড়ল,—মেয়েটা তো খুব বাপসোহাগী হয়েছে!

স্বাতী হেসে বলল,—সে কি আর এমনি এমনি? বাবা বকাঝকা করে না, শাসনের বালাই নেই...

—তুই বা ওকে বকিস কেন? কী শান্ত মেয়ে...

—ওরকম মনে হয় মা। এক একসময়ে এমন গোঁয়ার্তুমি করে...। এই তো আজই দুপুরে খেতে পাক্কা দেড়ঘণ্টা লাগিয়ে দিল। মুখে গরাস নিয়ে গাল ফুলিয়ে বসে আছে তো আছেই। শেষে সেই চটাস চটাস খেল, তবে তার থালা শেষ হল। কাঁহাতক মাথা ঠিক রাখা যায়, তুমিই বলো?

—যাই বলিস, তোর ধৈর্য কিন্তু বড্ড কম।

খুবই সাধারণ অনুযোগ। তবু স্বাতীর যেন একটু গায়ে লেগে গেল। তার ধৈর্যহীন হওয়ার অপবাদটা যেন অঙ্গের ভূষণ হিসেবে স্বাতীর গায়ে চাপিয়ে দিয়েছে মা। অথচ তাকে এই সংসার-সমুদ্রে কী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাঁতার কাটতে হয়েছে, মা তা ভাল মতোই জানে। এখনও তো সাঁতরাচ্ছে, হাবুডুবু খাচ্ছে, নয় কি? এরপরও যদি স্বাতীর মাথায় অ্যাড্রেনালিন ক্ষরণ বেশি না হয়, সেটা কি খুব স্বাভাবিক হত?

তবে আজ তো একটু আমোদ-আহ্লাদ হইচই করতে এসেছে স্বাতী, তর্ক জুড়ে খামোখা হাওয়া গরম করবে কেন। সরমার কথাটাকে আমল না দিয়ে মণিকাকে বলল,—কী গো বউদি, একটু চা-টা হোক। গরমে মাথা ধরে গেছে, একটু ছাড়ুক।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বসাচ্ছি। তোমার বরকেও দেব। বলে চোখ ঘোরাল মণিকা, —তোমাদের কী প্রেম গো! তোমার বরকে কতবার করে চায়ের জন্য সাধলাম, কিছুতেই রাজি হল না। বলল, স্বাতী আসুক, একসঙ্গে খাব।

—আরে না না, সেজন্য নয়। প্রতীক হেসে ফেলল,—ভাবলাম আপনাকে দু'বার করে চা বসাতে হবে...

—ব্যাখ্যা দিতে হবে না মশাই, আমরা সব বুঝি। রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল মণিকা, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল,—আর আমাদের তিতলিসোনা এখন কী খাবে? একটু দুধ দিই?

—না গো, ও দুধ খেয়ে বেরিয়েছে। যদি একটু ম্যাগি থাকে...

—নেই মানে? তোমার ভাইপো তো শুধু ওইটেই ভালবেসে খায়।

—পাপু কোথায়? তাকে দেখছি না তো!

—আঁকার স্কুলে গেছে গো। এই এল বলে।

মণিকা রান্নাঘরে ঢুকে গেল। স্বাতী পা তুলে বসল সোফায়। তাপটা আজ বড্ড চড়া। মাথার ওপর ফুল স্পিডে পাখা ঘুরছে, তাও যেন স্বস্তি নেই। সালোয়ার কামিজের দোপাট্টায় কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম আলতো মুছে নিয়ে স্বাতী বলল,—কী গল্প হচ্ছিল শাশুড়ি জামাইয়ের?

প্রতীক কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সরমার স্বর বেজে উঠেছে, —হ্যাঁ রে, প্রতীকের এ কী আক্কেল? ও নাকি সেঁকোবিষ নিয়ে ছবি করছে?

—আহ্, সেঁকো বিষ কেন হবে? আর্সেনিক। জলে আর্সেনিক দূষণই এবার ওর সাবজেক্ট।

—সেঁকো বিষই যে আর্সেনিক তা বুঝি আমি জানি না? ওসব বিষ-টিষ নিয়ে ছবি না বানালেই নয়?

—পরিবেশ নিয়ে কাজ করতে গেলে আর্সেনিক এসে পড়ে মা।

—কেন? দুনিয়ায় আর কি বিষয় নেই? গাছগাছালি আছে, পশুপাখি আছে...

—ওহ্ মা! তুমি এ যুগের হয়েও সেই সুপারস্টিশাস রয়ে গেলে।

—আমার আর আধুনিক হয়ে কাজ নেই। আধুনিকপনার জীবন তো অনেক দেখলাম।

মা কি হুল না বিঁধিয়ে কথা বলতে পারে না? স্বাতীর মুখ সামান্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল। প্রতীকের বোধহয় নজরে পড়েছে, তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—আসলে ব্যাপারটা কী জানেন মা? আর্সেনিক পলিউশনটা আমাদের দেশে একটা বার্নিং প্রবলেম। বিশেষ করে এ রাজ্যে। হিসেব করে দেখা গেছে, এই স্টেটের তিন ভাগের এক ভাগ লোক কোনও না কোনওভাবে এই পলিউশানের শিকার। ফিল্মটা দেখলে পাবলিকের যদি একটু অ্যাওয়্যারনেস বাড়ে...। মাটির নীচ থেকে জল তোলাটা যদি কিছুটা হলেও কমায়...তাহলে বিপদ হয়তো খানিকটা সামাল দেওয়া যাবে। এসব ভেবেই না গভর্নমেন্ট...

—কী জানি বাপু।...যাই হোক, একটু সাবধানে কাজকর্ম কোরো। নিজের কোনও বিপদ বাধিও না।

সরমার কাল্পনিক উৎকণ্ঠায় হাসিই পেয়ে গেল স্বাতীর। কী জামাই-অন্ত প্রাণ হয়েছে, বাপস! কে বলবে এই প্রতীককে স্বাতী বিয়ে করতে চায় বলে মা'ই একদিন সবচেয়ে বেশি আপত্তি জুড়েছিল। অবশ্য তারও একটা কারণ ছিল। কে যে মাকে কী বুঝিয়েছিল, মার দৃঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছিল প্রতীকের সঙ্গে অনেকদিন ধরেই লটঘট চলছিল স্বাতীর। গৌতম যে স্বাতীর সঙ্গে অশান্তি করেছিল, ওই পেয়ার মহব্বতই নাকি তার মূল উৎস! স্বাতীকে তখন হাজার বার বলতে হয়েছে প্রতীককে সে আগে চিনতই না, ডিভোর্সের মামলা ফাইল করার অনেক পরে তার প্রতীকের সঙ্গে আলাপ। মা বিশ্বাস করেছিল কিনা কে জানে, তবে শেষে পাচন গেলার মতো মেনে নিয়েছিল। মাত্র পাঁচ বছরে সেই মার কী আমূল পরিবর্তন!

এই পরিবর্তনের পিছনে অবশ্য প্রতীকেরও অবদান কম নয়। মধুর ব্যবহার আর নিপুণ বাক্যকুশলতায় এমনভাবে মানুষের মন জয় করতে পারে প্রতীক! স্বাতীকেও তো জিতে নিয়েছিল, নয় কি? স্বাতীর চোখে বিশ্বসংসারের চেহারা যখন পাঁশুটে মেরে গেছে, ওই প্রতীকের সান্নিধ্যেই না ফিরে পেয়েছিল পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ।

ঝাং ঝাং ঝাং কলিংবেল বাজছে। স্বাতী দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই সাঁ করে ঢুকল পাপু। ঘর অবধিও গেল না, দাঁড়িয়ে পড়েছে তিতলির সামনে। বোনের নাকে নাক ঘষে দিয়ে বলল,—হাই!

তিতলির মুখমণ্ডল হাসিতে ভরে গেল। খুশিতে চোখ পিটপিট করছে।

পাপু কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। ঘাড় বেঁকিয়ে প্রতীককে বলল, —বনুকে কোলে নিয়ে বসে আছ কেন পিশাই? ওকে নামিয়ে দাও।

প্রতীক ভুরু নাচাল,—কেন রে?

—ও আমার সঙ্গে যাবে।

—কোথায়?

—আমি রোড রেস খেলব, বনু দেখবে।

ও মা, বলার সঙ্গে সঙ্গে তিতলি তো বেশ গুটগুট হাঁটা দিল! পাপুও ভারী যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছে বোনকে।

দৃশ্যটা দেখে স্বাতীর বুকে স্মৃতির পলকা দোলা। তার দাদাটাও বড় স্নেহশীল ছিল ছোটবেলায়। স্বাতী কত খেলনা ভেঙেছে দাদার, মাকে দাদা জানতেই দিত না। স্বাতী কোনও দুষ্টুমি করেছে, মা যেই না মারতে এল, দু' হাত দিয়ে বোনকে আড়াল করে দাঁড়াত দাদা। পাপুও কি তিতলির সেইরকম দাদা হবে? অবশ্য বড় হয়ে কে যে কী পদের হবে তা কি এই বয়সে বোঝা যায়? সম্পর্কে স্বার্থ যখন ঢুকে পড়ে, তখন ওই দাদাই যে কী রূপ দেখাতে পারে সেও তো স্বাতী মর্মে মর্মে জানে।

চা এসে গেছে। সঙ্গে কাজুবাদাম আর গাদাখানেক মিষ্টি। প্রতীক দেখে হাঁ হাঁ করে উঠল,—এত কেন? এরপর তো রাতে কিছু খেতেই পারব না।

মণিকা হেসে বলল,—কিছুই এমন দেওয়া হয়নি। কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ হাত চালান।

স্বাতী কাপ-প্লেট তুলে নিল হাতে। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল,—রাত্তিরে আজ কী মেনু?

—তেমন কিছু নয়। প্লেন ডালভাত বলতে পার।

—আমার ডালভাতই ভাল। রিচ খাবার তো আমার পেটে সয় না। প্রতীক লঘুস্বরে বলল,—ডালে নিশ্চয়ই মাছের মাথাফাথা দেননি?

—দিতেও পারি।

—তাহলে তো ভাজাভুজিও নিশ্চয়ই কিছু করতে হয়েছে? ফ্রাইট্রাই গোছের?

—হতেও পারে।

—এই গরমে নিশ্চয়ই চিংড়ি মাছের ঝামেলায় যাননি? মালাইকারিটা খুব হেভি হয়ে যায়, তাই না?

—মোটেই না। দিব্যি খাওয়া যায়।

—বড় কষ্ট হয়। বিশেষত এরপর যদি মাটনটাটন থাকে।

—কায়দা করে আইটেমগুলো জেনে নেওয়া হচ্ছে, অ্যাঁ? আমি কিন্তু আর কিছু বলব না। খেতে বসে জানবেন, সোনামুখ করে থালা শেষ

করবেন। আজকের দিনটায় জামাইদের কোনও ওজর-আপত্তি চলে না, বুঝেছেন মশাই!

—বিপদ হবে আপনার ননদের। সারারাত হাঁসফাঁস করব, আর ও বেচারাকে জেগে থাকতে হবে।

—জাগবে। জেগে পতিসেবা করবে। এ তো পুণ্যের কাজ।

নন্দাই আর শালার বউয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলছে। শুনতে মন্দ লাগছিল না স্বাতীর। তবু শেষ বাক্যটা কেমন যেন কানে বাজল। অবিকল এই কথাটাই মা একবার গৌতমকে বলেছিল না? কী প্রসঙ্গে যেন? কী প্রসঙ্গে যেন? উঁহু, মনে পড়ছে না। মানুষটার ভাল ভাল স্মৃতিগুলো এর মধ্যেই এমন আবছা হয়ে গেছে।

এলোমেলো আলাপচারিতা চলছে এখনও। একটু একঘেয়ে লাগছিল স্বাতীর, উঠে পাশের ঘরটায় এল। একসময়ে তার নিজের ছিল ঘরখানা। কুমারীবেলায়। গৌতমদের বাড়ি থেকে যখন উৎখাত হয়ে এল, তখনও। ঘরটা এখন বইখাতা আর বাতিল জিনিস শোভিত গুদাম। তবে স্মৃতিচিহ্নের মতো তার ছোট আলমারিটা আছে এখনও। সিংগলবেড খাটখানাও।

ওই খাটে কত রজনী যে কেটেছে! বিনিদ্র। তাতানকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হওয়ার পর। ছেলেটা যে কী করছে এখন? মার কথা কি ভাবে কখনও? দিদিমা, মামা, মামি, পাপু বোধহয় ওর মন থেকে মুছেই গেল। দেখা হওয়ার সময়টুকুতে কখনও তো কারোর কথা জিজ্ঞাসাও করে না। স্বাতী অবশ্য বলে। নিজে থেকেই। তবে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করে না তাতান, শুনে যায় শুধু। পরিচর্যা না করলে কোনও সম্পর্কই টেকে না। স্বাতীর পরিমণ্ডল বুঝি ক্রমশ ধূসর হয়ে যাচ্ছে তাতানের চোখে।

—কী রে, খাটে বসে এখানে কী করছিস? ওদিকে তোর মোবাইল বেজে যাচ্ছে যে!

সরমা। হাতে স্বাতীর সেলফোন।

নিজের মোবাইলে চোখ রেখে স্বাতী বলল,—কেটে গেছে তো।

—তোর ব্যাগের ভেতর ছিল যে। বের করতে করতে বাজনা থেমে গেল।

মিসড কলের নম্বরটা দেখল স্বাতী। উঁহু, চেনা নয়। কে যে কোত্থেকে নম্বর পায়! কোনও পুরনো বন্ধুও হতে পারে অবশ্য। কারোর কাছ থেকে হয়তো জোগাড় করে...। কল ব্যাক করবে স্বাতী? থাক গে, তেমন দরকার থাকলে ও পক্ষই আবার...।

সরমা এখনও দাঁড়িয়ে। মেয়েকেই দেখছে যেন।

স্বাতী জিজ্ঞেস করল,—কিছু বলবে?

—হুঁ। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার বসার জায়গাটা যেন দেখে নিয়ে সরমা গলা নামাল,—প্রতীক আমাকে হঠাৎ তোদের ওখানে গিয়ে থাকতে বলছে কেন রে?

প্রস্তাবটা প্রতীক পেড়েই ফেলল? স্বাতী নিষেধ করা সত্ত্বেও? এই এক স্বভাব প্রতীকের। নিজে যা যুক্তিযুক্ত মনে করবে তা করেই ছাড়বে। এও বোধহয় এক ধরনের ইগো। নিজের যুক্তিতে স্বাতীর আপত্তির কারণ খুঁজে পায়নি বলে...।

স্বাতী কি এমনি এমনি মাকে নিয়ে যেতে চায় না? একদিন-দু'দিন হলে ঠিক আছে, কিন্তু স্থায়ী ভাবে মা গেড়ে বসলে স্বাতীর সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগবেই। তার এই টিভি চ্যানেলে চাকরি করাটাই তো মার এখনও পছন্দ নয়। স্বাতীর মনে আছে, সে খড়দা থেকে দমদম চলে আসার পর মা কী সব সিন করত। দাদাকে আড়ালে ডেকে বলত, গৌতমকে ফোন কর, মেয়েটাকে যেন ক্ষমাঘেন্না করে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। শুনে স্বাতী তো রেগে টং, খুব চোটপাট করত মার ওপর। সরমার তবু তখন এক রা, গৌতম তো অন্যায় কিছু বলেনি। যে চাকরির সময়ের কোনও ঠিকঠিকানা নেই, ঘরের বউ কেন সেই কাজ করবে! ডিভোর্সের পর তো হাজার বার বলেছে, অন্যায় নাকি স্বাতীরই। টিভি চ্যানেলের চাকরিটা তার ছেড়ে দেওয়াই উচিত ছিল। এখনও কি মার গজগজানি থেমেছে? ফোনে তো হরবখতই মার বিরক্তি গিলতে হয়। সরমার বদ্ধমূল ধারণা, প্রতীক আর তিতলিকেও এখন যথেষ্ট অবহেলা করে স্বাতী। টিভি চ্যানেলের ওই অখদ্যে চাকরির কারণেই।

কিন্তু প্রতীক যখন তির ছুঁড়েই দিয়েছে, স্বাতী তো আর ব্যাগড়া দিতে

পারে না। মা নির্ঘাৎ তার অন্য কিছু অর্থ করবে। স্বাতী আলগোছে বলল, —কাজের মেয়েটার ওপর তো বড্ড বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়েছি...তাই তুমি যদি গিয়ে থাকো...সংসারের মাথায়...

—তা হয় নাকি? আমি না বলে দিয়েছি। শাশুড়ি জামাইবাড়ি গিয়ে থাকবে, এ কেমন কথা!

স্বাতীর বুক থেকে অনেকটা ভার নেমে গেল। তবু মার শেষ বাক্যটা একটু যেন বাজল কানে। হালকা গলায় বলল,—জামাইবাড়ি বলছ কেন? ওটা তো তোমার মেয়েরও বাড়ি। আমিও দস্তুর মতো ফ্ল্যাটের লোনের টাকা শোধ করি।

—সে তোমাদের ব্যাপার। আমার কাছে ওটা জামাইয়েরই বাড়ি। ওখানে গিয়ে থ্যাপন জুড়ে বসাটা আমার মোটেই শোভা পায় না।

—যেও না তাহলে। মার সঙ্গে একমত না হওয়া সত্ত্বেও স্বাতী প্রসঙ্গটা চেপে গেল। মোবাইলে সময়টা দেখতে দেখতে বলল,—দাদা এখনও এল না যে বড়?

—ব্যাঙ্কের চাকরিতে আজকাল খাটাখাটুনি খুব। তার ওপর যায় এই দমদম থেকে সেই নিউ আলিপুর। দূরটাও তো কম নয়। চাইলেও কি আর তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে?

মনে মনে একটু হাসিই পেল স্বাতীর। তাকে যে কী চরকি খেয়ে বেড়াতে হয়, মাকে যদি বলে এখন...! মা মোটেই বাহবা দেবে না অবশ্য। বরং হয়তো মুখ ভেটকাবে। স্বাভাবিক। পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ—মার পছন্দ হবে কেন।

মাকে পাশ কাটিয়ে স্বাতী বসার ঘরে এল। কার সঙ্গে যেন মোবাইলে কথা বলছে প্রতীক। নীচু গলায়। তন্ময় হয়ে। অদূরে ডাইনিং টেবিলে তিতলিকে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে পাপু। পায়ে পায়ে একবার রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি দিল স্বাতী। মণিকা স্যালাড কাটছে। প্রতীকের সব চেয়ে প্রিয় আইটেম। আজকাল প্রতীকের খাতিরদারি বেড়েছে এ বাড়িতে। প্রথম বছর তো জামাইষষ্ঠীতে নেমন্তন্নই পায়নি। তখনও সকলের মনে খুঁতখুঁত ছিল যে। দেখতে-শুনতে কথাবার্তায় যেমনই হোক, দ্বিতীয় জামাই বলে কথা,

তাকে নিয়ে কি আর এক নম্বরটির মতো আহ্লাদ করা যায়? তার ওপর গৌতমের মতো পয়সাওয়ালা নয়, লেখাপড়া যতই করুক পাকা চাকরি-বাকরি নেই, লেকচার সেমিনার করে বেড়ায়, আর কী সব ফিল্ম-টিল্ম তোলে—এমন একটা আধাবাউন্ডুলে জামাই পেয়ে তারা কি পুলকিত হতে পারে? পরে যখন প্রতীক দুম করে রাজডাঙার ফ্ল্যাটটা কিনে ফেলল, তখন বুঝি জল ঢুকল কানে। টের পেল রোজগারপাতির মাপকাঠিতেও প্রতীক একেবারে ফ্যালনা নয়। তারপর থেকে মা তো বটেই, মণিকারও কী মধুর আপ্যায়ন।

মণিকা অবশ্য অভিনয়টা ভালই পারে। মনে যতই প্যাঁচ থাক, মুখ সবসময়েই মিষ্টি। স্বাতীকে একসময়ে কম জ্বালিয়েছে। খড়দা থেকে চলে আসার পর অসহায় উদভ্রান্ত স্বাতীকে প্রতি পদে টের পাইয়ে দিত, বাপের বাড়ির চৌকাঠ তার কাছে অনেক উঁচু হয়ে গেছে। কিন্তু মুখের হাসি হাসি ভাবখানা বজায় রাখত সর্বদা। তর্ক ঝগড়া হলে মনের জ্বালা তাও বেরনোর একটা রাস্তা পায়, সেটুকুও সুযোগ দিত না মণিকা।

এখন অবশ্য স্বাতীর সঙ্গে মণিকার কোনও স্বার্থের সংঘাত নেই। ননদিনী পাকাপাকি গেঁড়ে বসবে, এ সম্ভাবনা তো চলেই গেছে। সুতরাং তার হাসিটাও এখন আর তত মেকি নয় বোধহয়।

প্লেটে স্যালাড সাজাতে সাজাতে ওই হাসিরই একটা কুচি স্বাতীকে উপহার দিল মণিকা। জিজ্ঞেস করল,—তোমার ফিগারটা এখনও এত সুন্দর কী করে রেখেছ গো? জিম-টিমে যাও নাকি?

—দূর, ওসবের সময় কোথায়? সারাদিন অফিসের কাজে দৌড়েই কূল পাই না।

—যাই বলো. তোমার বয়সটা কিন্তু বেশ থেমে আছে। কে বলবে দুটো বাচ্চার মা? এখনও দিব্যি পঁচিশ-ছাব্বিশ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

সরল মনে বলল কি? নাকি স্বাতী ছেলের প্রসঙ্গ এ বাড়িতে এড়িয়ে চলে বলে স্মরণ করিয়ে দিল?

স্বাতী হাসল একটু। সতর্ক স্বরে বলল,—তুমিও তো কচি কচি আছ বউদি। এমন কিছু ফ্যাট গ্যাদার করোনি।

—তবু তো তোমার দাদা আমায় উঠতে বসতে ঢেপসি বলে। বাইরে কলিংবেল বাজল। ওমনি মণিকার চোখ উজ্জ্বল,—ওই তোমার দাদা এল।

হ্যাঁ, স্বপনই বটে। ব্যস, কয়েক মিনিটের মধ্যে বাড়ি জমজমাট। জামাকাপড় না বদলেই প্রতীকের সঙ্গে আড্ডায় মেতে উঠল স্বপন। তার মাঝেই কখনও তিতলিকে চটকাচ্ছে, স্বাতীকে খেপাচ্ছে, চায়ের অর্ডার ছুড়ছে মণিকাকে। কথায় কথায় প্রতীককে বলতে শুরু করল এ বাড়ি নিয়ে তার আশু পরিকল্পনার কথা। স্যাংশান প্ল্যান তো আছেই, সেই মোতাবেক দোতলাটাকে আরও বাড়াবে এবার। তাছাড়া একতলাতেও অনেককাল হাত পড়েনি, একটু-আধটু মেরামতির প্রয়োজন, গোটা বাড়িটা একবার রং করে নিলেও মন্দ হয় না...

বলতে বলতে স্বপনের ভুরুতে ভাঁজ,—একটাই প্রবলেম হচ্ছে, বুঝলে ভাই।

বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে প্রতীকের তেমন আগ্রহ নেই। তবু জিজ্ঞেস করল,—কী?

—বাড়ি তো মার। মা আমাকে লিখে না দিলে তো লোন পাব না।

—মার নামেই লোন নিন। বাড়িটা তো সিকিউরিটি থাকছেই।

—কিন্তু তাতে যে ইন্টারেস্টে অনেক বেশি পড়বে। আমি ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ি হিসেবে লোন নিলে যা সুদ দেব, তার চেয়ে ঢের বেশি লেগে যাবে।

—সে নয় আমি তোকে লিখে দেবখন। সরমা বলে উঠল,—তুই হিসেবপত্র কর। দ্যাখ কত কী লাগে।

—বলছ?

—বলছি তো। থাকবি তো তোরাই। মনের মতো করে বানিয়ে নে।

স্বাতীর ভারী বিস্ময় জাগছিল। বুঝি বা আহতও হচ্ছিল মনে মনে। সে সামনে বসে, মেয়ে হিসেবে এ বাড়িতে তার হক দাদার চেয়ে কিছু কম নয়, অথচ তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হচ্ছে? সে তার ভাগ নিক, না নিক, একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করবে না? মুখ ফুটে সে বলে ফেলবে কিছু? প্রতীকের সামনে সেটা কি ভাল দেখাবে?

হায় রে, কিল খেয়ে কিল হজম করাই বুঝি স্বাতীর নিয়তি!

পুরনো একটা ছবি স্বাতীর চোখে দুলে উঠল। মাত্র ছ'-সাত বছর আগের, এখনও তেমন ঝাপসা হয়নি। দাদার ছোট শালি চলে গেছে একটু আগে, বউদির মিছরির ছুরির খোঁচায় তখনও ছটফট করছে স্বাতী। একসময়ে সটান হাজির হল স্বপনদের ঘরে। ভেজা ভেজা গলায় দাদাকে প্রশ্ন করল,—আমি এখানে আছি বলে তোদের কি অসুবিধে হচ্ছে?

ঘরের ছোট টিভিটায় স্বপন খেলা দেখছিল। নীরস গলায় বলল, —এখন তো একটু স্পেসের প্রবলেম হচ্ছেই।

—আমি বাড়ির মেয়ে, আমি থাকলে তোদের জায়গা কম পড়ে যায়?

—যা ফ্যাক্ট, তাই তো বলছি।

—তাহলে আমি যাব কোথায়?

—যেখানে তোর থাকা উচিত। গৌতমদের বাড়ি।

—ভাল মতোই জানিস, সেখানে ফেরা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—আর সেইজন্য আমাদের একটা ঘর ত্যাগ করতে হবে? দেখতেই তো পাচ্ছিস আমার শ্বশুরবাড়ির লোকরা অনবরত আসা-যাওয়া করে। মণিকা কক্ষনো কাউকে থাকতে বলতে পারে না। ওর বোনটা তো আজ চলেই গেল। এখন গোটা শহরটা উজিয়ে সে বেহালায় ফিরবে। ভাল লাগে এসব?

—এটা তো আমার দেখার বিষয় নয়। আমি তো উড়ে এসে জুড়ে বসিনি। বাবার বাড়িতে থাকার আমার রাইট আছে। আর সেই অধিকারটা তোর চেয়ে...

—ভাই বোনের সম্পর্কে রাইট এনে ফেলছিল খুকু? তাহলে তো অনেক কথাই চলে আসে রে। টিভি অফ করে স্বপন ঘুরে বসল। হিম হিম গলায় বলল,—তোর বিয়েতে প্রায় সাত লাখ টাকা খরচা হয়েছিল। আমাকেও ধার করতে হয়েছিল লাখ দেড়েক। তোর অধিকারের হিসেবে এটা আছে? তোর বিয়ের পর বাবা প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে মারা গেল। অধিকারের হিসেবটায় এটাও রেখেছিস তো? সেই বিয়েটাও তুই টিকিয়ে রাখতে পারলি না। বাবার তো সর্বস্ব, এবং আমারও, পুরো অর্থটাই জলে গেল। এটাও নিশ্চয়ই তোর অধিকারের মধ্যে পড়ে?

—তুই এভাবে অ্যাকিউজ করছিস কেন? অনেক বিয়েই তো সাকসেসফুল হয় না। তোদের তো বলেছি ওরা কীরকম লোক, গৌতম কতটা অভদ্র...

—সবই তো বুঝছি। তোকেও তো কিছু কিছু ব্যাপার বুঝতে হবে। কথায় কথায় অধিকার ফলানোটা তোর পক্ষে শোভন নয়। আমাদের সুবিধে- অসুবিধেগুলোকে একটু মর্যাদা দিতে শেখ।

এমন রূঢ়ভাবে স্বপন কথাগুলো বলেছিল, স্বাতীর আর বাক্যস্ফূর্তি হয়নি। নিজের খুপরিটায় এসে ঠায় জেগে ছিল সারারাত। পরে সেই দাদারই কী পরিবর্তন! কত নরম সুরেই না বলেছিল,—আমার ওপর রাগ করে ডিভোর্সের পরপরই এমন একটা ডিসিশান নিচ্ছিস না তো খুকু? একখানা ঘর নিয়ে তো থাকবি, থাক না যত দিন খুশি।

পাকাপাকি মুশকিল আসান হয়ে গেল বলেই বুঝি এক টুকরো উদারতা ছুড়ে দিতে পেরেছিল দাদা। তখন বোধহয় বুঝেও গিয়েছিল, আর ট্যাঁ ফোঁ করবে না বোন, তার বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দেড়-দু' বছর ধরে যা মোক্ষম শিক্ষা দিয়েছে, আর অধিকার অধিকার বলে চেঁচাবে না স্বাতী। মা যে তার পাশে আছে, সেটাও তো জানে দাদা। তাই না আজ তাকে আমল না দিয়েই...

গোটা সন্ধেটা আর সমে ফিরতে পারল না স্বাতী। হাসল, কথা বলল, খাওয়াদাওয়া করল, কিন্তু ভেতরটা কেমন ছানা কেটে গেছে। উপহারও মিলছে কিছু। তিনজনেরই। দেখল আলগা আলগা চোখে। খুশি খুশি ভাবও ফোটাল। কিন্তু চোরা বিষাদটা যেন লেগেই রইল বুকে।

বেরোতে বেরোতে প্রায় রাত দশটা। পাপুর সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে তিতলি ক্লান্ত, ঘুমিয়ে পড়েছে। ট্রেন বাসের চক্করে গেল না প্রতীক, ট্যাক্সি ধরে নিল। ফিরছে।

স্বাতী চুপচাপ। ফাঁকা চোখে দেখছে রাতের শহর।

প্রতীকই হঠাৎ বলল,—কী গো, এমন গুম মেরে কেন?

স্বাতী জবাব দিল না।

—বাড়ি নিয়ে দাদা আর মার কথাগুলো হজম হয়নি তো? প্রতীক মৃদু

হাসল,—আরে বাবা, যেতে দাও। ও বাড়ির ভাগ না পেলে তোমার কি জীবন বৃথা হয়ে যাবে?

—সব কিছু হজম করাই তো আমার কপাল। স্বাতীর ঠোঁট নড়ল, —তোমাকে বললাম মাকে আমাদের কাছে এসে থাকার কথা বোলো না। আমার কথা তুমি রাখলে কি? সেটাও তো হজম করে নিয়েছি।

পলকের জন্য প্রতীক থতমত। পরক্ষণে সহজ সুরে বলল,—আরে দূর, ওটা সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? আমি তো নিশ্চিত ছিলাম উনি ছেলের সংসার ছেড়ে আসতে রাজি হবেন না। জাস্ট প্রোটোকলের মতো বললাম আর কী।

—কোনও প্রয়োজন ছিল?

—ছিল তো...

নিজের মতো করে যুক্তি সাজিয়ে দিচ্ছে প্রতীক। স্বাতী শুনছিল না। শুনতে ইচ্ছেই করছে না যে!

চার

ইদানীং মনমেজাজটা ভাল যাচ্ছে না গৌতমের। ব্যবসার যা হাল! কনস্ট্রাকশান লাইনে নেমে প্রথম সাত-আটটা বছর চুটিয়ে কাজ করেছিল। তারপর থেকে তো ক্রমশ ভাঁটির টান। সোদপুর খড়দা পানিহাটিতে ক'টাই বা আর নতুন বিল্ডিং কমপ্লেক্স তৈরি হয়। যদিবা হয়ও, লাইন পুরো হাঙর কুমিরে ভরে গেছে। তাদের সঙ্গে লড়ালড়ি করে পেরে ওঠা দায়। কাজ পেলেও শতেক বখেড়া। চুক্তিমাফিক দিনক্ষণ মেপে ফ্ল্যাট ডেলিভারি করাই তো মুশকিল। কথায় কথায় লেবার ট্রাবল্, মাল চুরি হয়ে যায়, গুণ্ডামস্তানরা অনবরত শুষছে...। আগে লোকাল পার্টিকে নিয়মিত গুঁড়ো দিয়ে গেলে তারাই মোটামুটি ঝামেলা সামলে দিত। এখন সে মক্কেলরাও কেমন জবুথবু মেরে গেছে। টালমাটাল দশা তো, কবে গদি ওল্টায় ঠিক নেই, তাই বুঝি বাবুরা পুরোপুরি গা লাগাতে চায় না। এত বছরের সরকার যদি পাল্টে যায়, তখন যে কী হবে? কারবারই না পুরোপুরি গোটাতে হয়।

খড়দার স্টেশন রোডের অফিসটায় বসে এইসবই সাতপাঁচ দুর্ভাবনা

করছিল গৌতম। শহরতলির মিনি সুপার মার্কেটের একতলায়। বছর সাতেক আগে গৌতমই তুলেছিল মার্কেট বিল্ডিংটা। নাফা মন্দ হয়নি। লাভের অংশে বুদ্ধি করে তিন তিনখানা দোকানঘরও রেখে দিয়েছিল। পাশাপাশি। একটা দোকান ভাইকে দিয়েছে। আর একটা ভাড়ায়। তিন হাত ঘুরে ডানলপের এক মোনা পাঞ্জাবি সেখানে রেডিমেড পোশাকের শোরুম খুলেছে, চলে রমরমিয়ে। প্রোমোটারি ছেড়ে গৌতমকেও ওরকম কিছু একটা খুলতে না হয় এবার।

কাচের দরজা ঠেলে মধ্যবয়সি এক দম্পতি ঢুকছে। গৌতমের চেনা। থাকে চক্রবর্তী পাড়ায়। কাছে কল্যাণগড়ে একটা প্রোজেক্ট চলছে গৌতমের, সেখানে একটা ফ্ল্যাট বুক করেছে এরা।

গৌতম হাসি হাসি মুখে বলল,—আরে সমরদা যে বউদিকে নিয়ে হাজির আজ? কী ব্যাপার?

—একটু কথা ছিল ভাই। আমার মিসেস তোমাকে কিছু বলবে।

—বসুন তো আগে।...বউদির কিছু ফরমায়েশ আছে বুঝি?

—ফরমায়েশ নয়, বলো আবদার। চেয়ারে বসে লজ্জা লজ্জা মুখে বলল মহিলা,—কাল বাড়িটার ওখানে গিয়েছিলাম। তিনতলা অব্দি তো উঠে গেছে।

—হ্যাঁ। শুধু চারতলাটা ঢালাই বাকি। তারপর তো ভেতরের কাজ শুরু হবে।

—জানি তো। সেইজন্য তো আগে এসে বিরক্ত করিনি।...আমাদের ঘরগুলোর সাইজ একটু অদল বদল করে দিতে হবে ভাই।

—সে তো সমরদা বলেইছিলেন। আমার নোট করা আছে।

—না না, ওটা হবে না। একটু অন্যভাবে করতে চাইছি। একটা ঘর সামনে বাড়াব, একটা সাইডে। বাথরুমটা সামান্য ছোট হয়ে যাবে। ছ'ইঞ্চি, আট ইঞ্চি মতোন।

ওফ্, কী জ্বালা! এত বায়নাক্কা সামাল দেওয়া যায়? বারোখানা ফ্ল্যাটের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আর্জি জানিয়ে যাচ্ছে। সকলের সব বাসনা

পূরণ করতে গেলে মাথার চুলগুলো ঝরে যাবে গৌতমের। তবু ক্লায়েন্ট তো লক্ষ্মী, হাসিমুখে সবার সব কথা শুনতেই হয়।

গৌতম কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,—নো প্রবলেম বউদি। তিনতলার ব্রিকওয়ার্ক শুরুর আগে আপনাদের ফোন করব, মিস্ত্রিদের একটু বুঝিয়ে দেবেন। যদি পিলার টিলার না পড়ে তবে হয়ে যাবে। অবশ্য বোঝেনই তো, মিউনিসিপ্যালিটির লোকরা ওঁৎ পেতে থাকে, প্ল্যানের সঙ্গে কনস্ট্রাকশান না মিললেই কমপ্লিশান সার্টিফিকেটে ঝামেলা বাধায়। এখন তো ডামাডোলের বাজার, বহুৎ কড়াকড়ি।

—তাহলে?

—সমস্যাও আছে, তার সমাধানও আছে। বাড়তি কিছু দিতে হবে আর কী।

—কত?

—সে আমি তখন বলবখন। এই বড় জোর দশ-বিশ হাজার। মনে মনে একটু হেসে নিল গৌতম। কারোর প্রার্থনা মেটালে সেখান থেকে তার হিস্যা থাকবে না, এ তো হয় না। ওই দশ-বিশ থেকে যেটুকু আসে, সেটাই লাভ। স্মিতমুখে গৌতম বলল—আর কিছু?

—হ্যাঁ, আর একটা ব্যাপার। এবার সমর গলা ঝাড়ল,—তোমাকে তো চারটে ফেজে আমার টাকা দেওয়ার কথা। তার দ্বিতীয় কিস্তিও আমি পে করেছি। থার্ডটাও অগাস্টে পেয়ে যাবে। ফোর্থ অ্যান্ড ফাইনালটা নিয়ে একটু প্রবলেম হচ্ছে ভাই।

—তাড়া তো নেই। কাজ শেষ হতে হতে সেই নভেম্বার ডিসেম্বার।

—তখনও পারব কি? ছেলেটাকে ডাক্তারি পড়াতে তামিলনাড়ু পাঠাচ্ছি, অনেক খরচা আছে। তুমি যদি কিছু লোন অ্যারেঞ্জ করে দাও...তিন-চার লাখ মতোন...। সমর ঝুঁকল সামান্য,—তুমি তো দাও, আমি শুনেছি।

এই একটা ধান্দাও গৌতমের আছে বৈকি। ব্যাংকের চেয়ে বেশি কিন্তু কাবুলিওয়ালার চেয়ে কম রেটে টাকা খাটায়। যারা ফ্ল্যাট কিনতে আসে তাদেরই দিত প্রথম প্রথম। এখন স্থানীয় দোকানদাররাও তার খদ্দের।

নগদের কারবার, হ্যান্ডনোটে লেখা হয়, কাজ চুকলে কাগজখানা ছিঁড়ে ফেললেই ঝঞ্ঝাট খতম। তবে বুঝেশুনে লোক চিনে ধার দিতে হয়, এই যা।

ক্ষণকাল সমরকে নিরীক্ষণ করে গৌতম বলল,—রেট কিন্তু একটু বেশি পড়ে যাবে দাদা। এক বছরে শোধ করলে আঠেরো পারসেন্ট, তিন বছরে হলে চব্বিশ।

—মানে মাসে দু' পারসেন্ট?

—হ্যাঁ দাদা। লাখে মোটামুটি পাঁচ হাজার করে মাস মাস।

—হুম্। একবার গিন্নির দিকে তাকাল সমর। তারপর চশমা ঠিক করতে করতে বলল,—আচ্ছা দেখি কী করা যায়।

—নো প্রবলেম। দরকার হলেই বলবেন, আমি আছি।

দম্পতি উঠে দাঁড়াল,—আজ তাহলে চলি তাই।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান। একটু চা খেয়ে যান।

—না না, এই অবেলায় আর চা নয়। এখন স্নান-খাওয়া করার টাইম।

—আসুন তাহলে। আবার দেখা হবে।

চলে গেল দম্পতি। মনমরা ভাব যেন একটু কেটেছে গৌতমের। ক্লায়েন্ট টায়েন্ট এলে সে একটু চাঙা বোধ করে। নইলে থম মেরে বসে থাকতে কি কারোর ভাল লাগে! আড়াইটে বাজে, আজ আর একবার সাইটে ঘুরে এলে হয়। ঘন ঘন হানা দিলে সুপারভাইজার ছোকরা বরুণও তটস্থ থাকে, মিস্ত্রিরাও ফাঁকি মারতে ভয় পায়। অবশ্য ওয়ার্ক কালচারের যা হাল, মিস্ত্রি-মজুরদের দিয়ে কাজ করানোই মুশকিল। টাকা নেওয়ার বেলায় হাত লম্বা, ওদিকে শালারা ঝাণ্ডা উঁচিয়েই আছে। সরকার বদলালে এরা কি টাইট খাবে? মনে হয় না। বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন হলেও হতে পারে। কিন্তু মানুষের স্বভাব বদলাবে কি? এই তো স্বাতী...আস্ত একটা বর বদলে গেছে, তবু তার কী পরিবর্তন ঘটেছে? সেই একই রকম চোপা করে, একই ভঙ্গিতে মেজাজ দেখায়...। অবশ্য জব্বর ঝামা দিয়ে ঘষা গেছে মেয়ে-মানুষটার মুখ। নে, যা পারিস কর, দেখি তোর মুরোদ।

ভেবেই গৌতম আর একটু প্রফুল্ল বোধ করল। মোটরবাইকের চাবিটা

নিয়ে উঠে পড়ছিল, হঠাৎ ভাইয়ের আবির্ভাব। ব্যস্তসমস্ত গলায় প্রীতম বলল,—তুই বেরিয়ে যাচ্ছিস নাকি?

—হ্যাঁ। কল্যাণগড় যাচ্ছি।

—একবার আমার দোকানে আসবি?

—কেন?

—ভোডাফোন থেকে একজন এসেছে। ডিলারশিপ নিতে বলছে।

—তা কী করে হবে? তুই তো এয়ারটেলের সঙ্গে কাজ করছিস।

—ওটা বলছে ছেড়ে দিতে। বলছে, পুষিয়ে দেবে।...তুই একবার আয় না। লোকটার সঙ্গে কথা বলে দ্যাখ। ওরা অনেক কিছু অফার দিচ্ছে।

—আমি গিয়ে কী করব? ব্যবসা তো করছিস তুই।

—তবু...। প্রীতম নার্ভাস নার্ভাস গলায় বলল,—তুই কথা বললে ভরসা পাই। এগোতে পারি।

গৌতম মোটেই প্রীত হল না। বরং একটু বিরক্ত বোধ করল। ভাই তো নয়, মূর্তিমান একটা ল্যাঠা। নিজে নিজে সিডি ভিডিও ক্যাসেটের দোকান খুলেছিল, পর্নো ছবি রাখত বলে পুলিশ রেড হল দোকানে। বাবার তখন হাঁটু কাঁপছে। ছোটছেলেটির কোমরে দড়িই পড়ত, গৌতমই ওসি-কে ঘুষঘাষ খাইয়ে বাঁচিয়েছিল। তারপর এই মার্কেটে একখানা দোকানঘর দিয়ে, মোবাইল ফোনে সাজিয়ে, একটা সার্ভিস প্রোভাইডারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, ডিলারশিপের বন্দোবস্ত করে, মোটামুটি একটা হিল্লে করেছে অপোগণ্ডটার। তবু শান্তি নেই? প্রতিটি পদে দাদাকে চাই। ওদিকে প্রেম করে দিব্যি তো নিজে নিজে ছাদনাতলায় গেল! তখন তো দাদার প্রয়োজন হয়নি! বাচ্চাও পয়দা করল। তখনও তো দাদার অনুমতি লাগেনি! শুধু ব্যবসা করতে গিয়েই যত আহ্লাদিপনা! যন্ত সব ঘাড়ে বন্দুক রাখার তাল।

গৌতম রুক্ষ স্বরে বলল,—আমি যাব না। তুই যা ভাল বুঝিস কর।

—দাদা প্লিজ...

—এই কাট্ তো। বোর করিস না।

ভাইকে প্রায় ঠেলেই অফিসঘর থেকে বার করল গৌতম। দোকানের শাটার নামিয়ে সটান গিয়ে উঠল মোটরসাইকেলে। প্রীতমকে আর কাকুতি মিনতি করার সুযোগ না দিয়ে পলকে ধাঁ।

ঘণ্টা দুয়েক মিস্ত্রিমজুরদের সঙ্গে কাটিয়ে গৌতম আর অফিসে গেল না। ফিরেছে বাড়িতে। গরমকালে বিকেল সন্ধেতে একবার স্নান করার অভ্যেস। গায়ে জল ঢেলে তাপ থেকে খানিক স্বস্তি পেল যেন। নিজের ঘরের টিভিটা খুলল। একটা খেলার চ্যানেলে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ দেখাচ্ছে। এককালে গৌতম ইস্টবেঙ্গল-অন্ত প্রাণ ছিল, খেলা থাকলে কত কী যে কাণ্ড করত। আজকাল আর মন লাগে না। শুধু খেলা কেন, কিছুতেই আর উৎসাহ বোধ করে না। বাড়ি ঢুকলেই অদ্ভুত এক শ্রান্তি ভর করে শরীরে। বিশেষ কোনও কাজকর্ম না থাকলে এ বেলা বেরোতেই আর পা সরে না। কোথায়ই বা যাবে? পুরনো বন্ধুরা সকলেই এখন ঘোরতর সংসারী, কারই বা এখন নিছক আড্ডা জমানোর সময় আছে? একমাত্র ক্লাবে গিয়ে তাস ক্যারাম খেলে কিছুটা সময় কাটানো যায়। এক-আধদিন যায়ও। পর পর ক'দিন গেলেই কেমন একঘেয়ে ঠেকে পরিবেশটা। তার চেয়ে বরং বিছানায় খানিক গড়াগড়ি দাও, তারপর উঠে একটু বোতল খুলে বসো, ঝিমঝিম ঘোর এলে নৈশাহারটি সারো, তারপর টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেই তো দিন শেষ। একটা করে দিন খসিয়ে ফেলার নামই তো বেঁচে থাকা, নয় কি?

ঊষা ঢুকেছে ঘরে। চা বিস্কুট নিয়ে। জিজ্ঞেস করল,—কী রে, খাবি তো কিছু এখন?

—কী দেবে?

—যা বলবি। রুটি বললে রুটি, পরোটা চাইলে পরোটা, চাস যদি ছোটবউ চাউমিনও বানিয়ে দিতে পারে।

কেন যে প্রীতমের বউটাকে মা ছোটবউ বলে কে জানে! বড়বউয়ের কোনও অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বে!

হালকা বিরক্তি নিয়ে গৌতম বলল,—কোনও হ্যাঙ্গামের দরকার নেই। রুটিই দাও।

—সঙ্গে আলু ভেজে দেব? না তরকারি? তোর বাবার জন্য সুজি হয়েছে...খাবি?

—কিছু একটা হলেই হল।

ঊষা চলে যাচ্ছিল, কী ভেবে ঘুরে এসেছে। প্রবীণ চোখ দু'খানা কুঁচকে বলল,—তাতান তো আজ স্কুল থেকে ফিরে খেলতে গেল না। গুম হয়ে বসে আছে।

—কেন? তার আবার গোঁসা কিসের?

—স্কুলে খুব বকুনি খেয়েছে। ক্লাসটেস্টে খারাপ করেছে তো।

লেখাপড়ায় তেমন জুত করতে পারছে না ছেলেটা। টিউটার রাখা হয়েছে, বইখাতা খুলে বসে, তবু কিছুই কেন যে মাথায় ঢোকে না?

ঊষা ফের বলল,—তুই একবার স্কুলে গিয়ে ওর ক্লাসটিচারের সঙ্গে কথা বল না।

—কী বলব? আমার ছেলেটা একটু মাটো? ওকে ক্ষমাঘেন্না করে দিন?

—মোটেই আমাদের তাতান মাটো নয়। যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে। পড়াশোনায় একটু অন্যমনস্ক, এই যা। কী করলে ওই দোষটা কাটবে সেটা একটু আলোচনা করে আয়।

—ও আমার পোষাবে না। বাবাকে পাঠাও। নয়তো তুমি যাও।

—আমি? হাঁটু কোমর নিয়ে বলে নড়তে পারি না। আর তোর বাবাকে দিয়ে কোনও কাজ হয়? ওকে তুই চিনিস না?

—তাহলে ওর কাকিমা যাক। গিয়ে শুনে আসুক।

—তা বললে হয়? তোর দায়িত্ব নেই? তুই ওর বাবা। আসল গার্জেন।

—দায়িত্ব ফায়িত্ব আমায় দেখিও না। ডিউটি তো আমি করি। ভাল স্কুলে বহুত টাকা খরচা করে পড়াচ্ছি, বলো তো আরও টিউটর লাগিয়ে দেব...

ঊষা একটুক্ষণ চুপ। তারপর অপ্রসন্ন স্বরে বলল,—সাধে কি বলি,

বাচ্চাদের একটা মা লাগে! নিজের মা তো তাতানের কপালে নেই, অন্তত একটা নকল মা। নইলে কি বাচ্চা ঠিকঠাক মানুষ হয়?

—ফের সেই ঘ্যানঘ্যান শুরু করলে?

—ভুল কথা তো কিছু বলিনি। তাতানের জন্য তো বটেই...এক বউ চলে গেছে বলে তুই বা বিবাগী হয়ে থাকবি কেন? সে তো দিব্যি আবার গুছিয়ে ঘরসংসার করছে। এবার আর ওরকম বারমুখো মেয়ে ঘরে আনবই না।

—আহ মা, থামবে?

—কেন চুপ করব? রাজি তো তুই হয়েছিলি। বেশ তো সম্বন্ধ দেখাদেখি চলছিল। কেন যে আবার হঠাৎ বেঁকে বসলি?

—টোপর পরার সাধ আমার চিরতরে মিটে গেছে। হয়েছে তো? এবার ফোটো দেখি। আমার খাবারটা পাঠাও।

—কী জানি বাবা। তুই যে ওই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটার কাছে এভাবে হেরে যাবি, আমি ভাবতেও পারি না।

গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল ঊষা। মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছিল গৌতমের। সত্যিই কি স্বাতীর কাছে সে হেরে গেছে? সুখের সংসার পেতে স্বাতী কি বদলা নিচ্ছে অপমানের? কিন্তু গৌতম কীই বা করতে পারে? অক্ষম ক্ষোভে ছটফট করতে পারা ছাড়া? আর তাতানকে না দেখতে দিয়ে মেয়েমানুষটাকে যথাসাধ্য হয়রান করা, ব্যস। এর বেশি আর কিছুই তো গৌতমের হাতে নেই। তবে এখনও স্বাতীকে তার কাছে নত হতে হয়। এটুকুই বা কম কী?

ফের একটা বিয়ে করলে জ্বালাটা কি জুড়োত? হয়তো বা। সেরকম বাসনা যে গৌতমের ছিল না, তা তো নয়। রাতের পর রাত, মাসের পর মাস নারীসঙ্গবিহীন থাকাটা যে কী দুঃসহ। কত রাত তো ঘুমই আসতে চায় না। সাধে কি মদের নেশাটা ধরল গৌতমকে! তাই মা যখন বিয়ের প্রস্তাবটা আনল, গৌতম তো সবুজ সংকেতই দিয়েছিল। দুটো তিনটে মেয়েও দেখা হল। শ্যামনগরের সেই হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের মেয়েটাকে তো পছন্দও করেছিল। কিন্তু সেই সুতপা নামের মেয়েটা কী একটা এস-এম-এস পাঠাল

গৌতমকে! ডোন্ট প্রসিড! আই ওন্ট ম্যারি ইউ! অপমানের চূড়ান্ত, শেষে কিনা একটা মেয়ে তাকে বাতিল করল! সেই হোমিওপ্যাথ ডাক্তারও পরে বাড়িতে ফোন করে জানিয়েছিল, ডিভোর্সি গৌতমকে নাকি মন থেকে মানতে পারছে না মেয়ে। এর পরও কি আবার ছাদনাতলায় যাওয়ার কথা ভাবতে পারে গৌতম?

এটাও কি স্বাতীর কাছে একধরনের পরাজয় নয়? হার জিতের খেলায় না যাওয়াটাই কি শ্রেয় ছিল? তখন তো সত্যিই কারোর সঙ্গে স্বাতীর আশনাই হয়নি, একটু মানিয়েগুনিয়ে নিলেই বোধহয় টিকে যেত সম্পর্কটা। কখনও চোটপাট, কখনও বাবা-বাছা—নরমে গরমেই নয় চলত দাম্পত্য। মূল সমস্যা তো ছিল একটাই। স্বাতীর রাত করে ফেরা। গায়ের জোর ফলাতে গিয়ে সেই রাতগুলোই তো পানসে হয়ে গেল গৌতমের। চিরকালের মতো।

এখনও সেই রাত্তিরটা স্পষ্ট দেখতে পায় গৌতম। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে। নীচের কোলাপসেবল গেট ঝাঁকাচ্ছে স্বাতী। নির্লজ্জের মতো ডাকছে, আহ, তালাটা খোলো, রাত্তিরে আর সিন কোরো না।

সন্ধে থেকে উসকে উসকে মা তখন মাথা আগুন করে দিয়েছে। গৌতম দোতলা থেকে চেঁচিয়ে উঠল,—কেউ খুলবে না। গত সোমবারই তোমায় লাস্ট ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছিল। অতএব আউট। গেট আউট।

—অ্যাই হচ্ছেটা কী? এখন এই মাঝরাতে..

—ফেরার সময়ে মাঝরাত কথাটা মাথায় থাকে না? ভেতরে ঢুকতে পাবে না, কেটে পড়ো।

—কোথায় যাব এখন?

—যে চুলোয় খুশি। যে জাহান্নমে ইচ্ছে।

—আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ? তখনও তেজ মরেনি স্বাতীর। ফুঁসে উঠল,—এটা আমারও বাড়ি।

কী স্পর্ধা! বিয়ে করে এন্ট্রি পেয়েছে শ্বশুরবাড়িতে, ওমনি নাকি সেটা নিজের বাড়ি হয়ে গেল!

সমঝে দেওয়ার জন্য তরতর নেমে এসেছিল গৌতম। গেটের এপার

থেকে তর্জনী নাচিয়ে বলেছিল,—রাইট মারিও না। এ তোমার বাপকেলে বাড়ি নয়। বেরোও। বেরোও সামনে থেকে।

গৌতম কি অন্যায় কিছু বলেছিল সেদিন? একটু নরম থাকা কি উচিত ছিল? কিন্তু যা জিদ্দিপনা দেখাচ্ছিল ওই মেয়ে। আস্কারা পেলে নির্ঘাত মাথায় চড়ে বসত।

যাক গে, মরুক গে, এভাবেই নয় কেটে যাবে জীবনটা। শুখা শুখা।

প্রীতমের বউ রুটি তরকারি রেখে গেছে। সঙ্গে সুজির হালুয়া। আনমনা মুখে খেয়ে ফেলল গৌতম। হাত ধুয়ে এসে পর পর কয়েকটা ফোন সারল। তারপর টিভিতে একটা হিন্দি সিনেমা চালিয়ে খাটে বাবু হয়ে বসেছে। একটু পরেই খুলবে বোতল গেলাস।

তখনই ফোনটা এল। মোবাইলে চোখ পড়তেই গৌতমের স্নায়ু টানটান।

স্বাতী!

গলাটা শক্ত করে গৌতম বলল,—আজ আবার কী দরকার?

—তাতানের জন্মদিনের ব্যাপারে বলছিলাম। শুক্রবার তাহলে ওকে আনবে না?

—সে তো বলেই দিয়েছি। বারবার এক কথা ঘেঁচিও না।

—তাহলে বৃহস্পতিবার তাতানকে আমার কাছে দাও। ছেলেকে নিয়মিত দেখতে পাওয়ার অধিকার তো আমারও আছে, নয় কি?

কী দুঃসাহস! দাবি জানায়! মাথা কি এমনি এমনি গরম হয় গৌতমের?

রুক্ষ স্বরে গৌতম বলল,—সরি। পারব না। শুক্রবারের পরে যোগাযোগ কোরো।

—এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমি কিন্তু আবার কোর্টে যাব।

গৌতমের ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। তাকে কি ভয় দেখাচ্ছে? সে যদি স্বাতীকে লেজে খেলায়, কোর্ট কতবার নাক গলাবে?

চড়াং করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল গৌতমের মাথায়। মেয়ে-ছেলেটাকে একটা পাল্টা বোমশেল মারা দরকার। রাগটা গিলে নিয়ে গলা

অস্বাভাবিক নরম করল গৌতম,—আহা, ওসবের কী দরকার? একটা সহজ সমাধান তো আছেই।

—কী?

—ছোট্ট একটা ডিল। কলকাতার কোনও একটা হোটেলে আমি রুম বুক করছি, সেখানে ঘণ্টাকয়েক আমার সঙ্গে কাটিয়ে যাও। পরদিনই তুমি তাতানকে দেখতে পাবে। তুমি যেখানে বলবে, সেখানে গিয়ে দেখিয়ে আনব।

ওপ্রান্ত নিশ্চুপ। বিস্ময় ক্ষোভ ক্রোধ কিছুই আসছে না ওদিক থেকে।

গৌতম ফের বলল,—কি, রাজি? তাতান কিন্তু তাহলে বৃহস্পতিবার হোল ডে তোমার।

ফোনটা কট করে কেটে গেল।

আস্তে আস্তে একটা বিজাতীয় হাসি ফুটে উঠল গৌতমের মুখমণ্ডলে। কী আদর্শ এক হেড আই উইন, টেল ইউ লুজ সিচুয়েশান। স্বাতী এবার খাবি খাক। কিংবা প্রাণের সুখে বরের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদুক।

পাঁচ

লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে স্বাতী দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। রগের শিরাদুটো এখনও দপ দপ করছে। শরীর আর চলছে না, এক্ষুনি খানিক গড়িয়ে নিতে হবে বিছানায়। মাথায় যা একখানা ডাঙশ মারল গৌতম!

কলিংবেল বাজাতে ইচ্ছে করছে না। নিঃসাড়ে দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকল স্বাতী। চটি ছাড়তে ছাড়তে থমকাল। শোওয়ার ঘর থেকে গলা উড়ে আসছে বাপ মেয়ের। সেই খেলাটাই চলছে এখন?

—তোমার নাম কী সোনামণি?

—তিতলি।

—ওটা তোমার ডাকনাম। ভাল নাম বলো।

—শরণ্যা। শরণ্যা বসু।

—বাবার নাম?

—প্রতীক বসু।

—বাহ্‌। কোথায় থাক তুমি? ঠিকানা কী?

—ছেষট্টি নম্বর প্রান্তিক পল্লি। রাজডাঙা।

তোতা পাখির মতো টকটক উত্তর দিয়ে চলেছে তিতলি। আহ্লাদি আহ্লাদি স্বরে। মেয়ের বুলি ফোটার পর থেকে এভাবেই ওকে নিজের নামঠিকানা মুখস্থ করায় প্রতীক। সব সময়ে ভয়, তিতলি যদি কোথাও হারিয়ে যায়! মেয়েও তেমনি, ভাল নাম বলার আগে রোজ একবার ডাক নামটা বলবেই। এটাই খেলা।

অন্যদিন খেলাটায় মজাই পায় স্বাতী। আজ যেন সেভাবে উপভোগ করতে পারল না। প্রশ্নোত্তরের খেলায় একটা বড়সড় ফাঁক আছে, মনে হচ্ছিল স্বাতীর। ফাঁক? না ফাঁকি।

ঘরে ঢুকে সামান্য ভার ভার গলায় স্বাতী বলল,—তিতলিকে মার নাম বলাটা শেখাও না কেন?

প্রতীক বিছানায় আধশোওয়া। হালকা গলায় বলল,—শেখানোর কী আছে? তিতলি তো জানেই।

—সে তোমার নামও তো জানে। তাহলে রোজ বলাও যে বড়?

—ও-কে। আজ তোমার নামও হোক। তিতলির গালে আলতো টোকা দিল প্রতীক,—তোমার মার নামটা বলে দাও তো সোনা।

তিতলি চোখ পিটপিট করে বলল,—মা? মা তো মা।

—দেখেছ তো, বাচ্চারা মাকে শুধু মা হিসেবেই আইডেন্টিফাই করে। প্রতীক সোজা হয়ে বসল। জ্ঞান দেওয়ার সুরে বলল,—আসলে ব্যাপারটা কী জান? বায়োলজিকাল ইন্সটিংক্ট হিসেবে বাচ্চারা মাকে শুধু মা বলেই চেনে। মায়ের নামটা সেখানে কোনও ফ্যাক্টরই নয়। বাবার ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট। সন্তানের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটাতে হয়। তাই সেখানে নামটার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে।

সেই যুক্তি আর যুক্তি। ভাল লাগছিল না স্বাতীর। কথা না বাড়িয়ে কাঁধের ব্যাগখানা ঢুকিয়ে রাখল আলমারিতে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার ক্লিপ দুটো খুলছে।

প্রতীক বুঝি দেখছিল স্বাতীকে। বলল,—তোমাকে আজ একটু বেশি ক্লান্ত মনে হয় যেন? খুব খাটুনি গেছে বুঝি অফিসে?

স্বাতীর সংক্ষিপ্ত জবাব,—হুঁ।

—অনেক বার বেরোতে হয়েছে?

—হুঁ।

—ফিরলে কিসে? বাসে?

—হুঁ।

—তোমাকে কতবার বলেছি, যেদিন বেশি ধকল যাবে, ট্যাক্সি ধরে নিও। সামান্য কটা টাকা বাঁচাতে গিয়ে শরীরটাকে বাড়তি স্ট্রেন করানোর কোনও মানে হয় না।

স্বাতী বলল না, আজ তার ট্যাক্সি নেওয়ারই ইচ্ছে ছিল। পর পর চারটে ট্যাক্সি প্রত্যাখ্যান করার পর আজ সে বাসে উঠেছে। কিন্তু আজ এমন একটা ঝাঁকুনি লেগেছে, তুচ্ছ এসব ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। উফ, গৌতম কিনা সরাসরি একটা নোংরা প্রস্তাব পেড়ে বসল! এমনই অতর্কিতে, পাল্টা কোনও জবাব মুখে এল না স্বাতীর!

প্রসঙ্গটা মন থেকে হঠাতে স্বাতী ঘরোয়া কথাবার্তা জুড়ল। বসল বিছানায়, তিতলির পাশটিতে। মেয়েকে জিজ্ঞেস করল,—তোমার খাওয়া হয়ে গেছে মামণি?

—হ্যাঁ। তিতলির ঘাড় কাত। পাকা পাকা ভঙ্গিতে বলল,—জান মা, আজ আমি নিজে খেয়েছি।

প্রতীক ফুট কাটল,—আমি গোল্লা গোল্লা করে বানিয়ে দিয়েছি, ও তুলে মুখে পুরেছে।

—বা রে, তাই বা কম কী? তিতলির চুল ঘেঁটে দিল স্বাতী। ভুরু নাচিয়ে বলল,—তা আজ তুমি কী খেলে মামণি?

—ফ্রায়েড রাইস। সবিতামাসি করে দিয়েছে।

স্বাতী খুশিই হল। সবিতাকে সে বলেই রেখেছে, মেয়ের মুখ বদলের জন্য মাঝে মাঝে যেন সে ভাতটা ভেজে দেয়। বিন, গাজর, ওমলেটকুচি, মুরগিসেদ্ধ সব মিশিয়ে। এমনিতে মেয়ের খাওয়ার যথেষ্ট প্যাখনা, তবে ওই ফ্রায়েড রাইসটা ভারি সোনামুখ করে খায়।

স্মিত মুখে স্বাতী বলল,—আজ বিকেলে কী করলি? সবিতামাসির সঙ্গে বেরিয়েছিলি?

—না তো। সবিতামাসি বিকেলে টিভি দেখছিল।

—দেখেছ? দেখেছ কাণ্ড? স্বাতী প্রতীকের দিকে ফিরল। ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে বলল,—গোটা বিকেল মেয়েটাকে ফ্ল্যাটে বন্দি করে রেখেছে!

—আহা, ওভাবে নিচ্ছ কেন? হয়তো কোনও ইন্টারেস্টিং সিনেমা টিনেমা হচ্ছিল, তোমার সবিতারানি আর টিভি ছেড়ে উঠতে পারেনি।

—সে যাই হোক না কেন, ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস। ওকে কি টিভি দেখার জন্য এতগুলো টাকা দিয়ে পুষছি? নাহ্...কালই ওকে একপ্রস্থ ঝাড় দিতে হবে।

—তোমার মেজাজটা যে দেখছি একেবারেই সমে নেই? তোমাদের প্রবীরদার কাছে কোনও গুঁতো খেয়েছ নাকি? প্রতীক মৃদু মৃদু হাসছে। হাসি হাসি মুখেই বলল,—যাও তো, বাথরুমে যাও। ঘেমো পোশাকগুলো ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে এসো, তাহলেই দেখবে মনটা ভাল লাগছে।

পরামর্শটা মন্দ নয়। উঠে পড়ল স্বাতী। গরমেও তার বার বার স্নান করার বাতিক নেই, তবু আজ দাঁড়িয়েই পড়ল শাওয়ারের নীচে। গৌতমের প্রস্তাবটা যেন বিষ্ঠার মতো লেগে আছে গায়ে, সাবান ঘষে ঘষে মুছল যেন। প্রতিটি রোমকূপে প্রবেশ করছে জলকণা, একটু একটু করে যেন জ্বালা জুড়োচ্ছে।

গৌতম আজ হঠাৎ এই অসভ্যতাটা করল কেন? স্বাতী আইন আদালতের কথা তুলেছিল বলে পাল্টা অপমান করল? নাকি সত্যিই আবার স্বাতীর শরীরটা চায়? হতেই পারে। শরীর ছাড়া আর কিছুই তো বুঝত না গৌতম। অত খেটেখুটে ফিরত স্বাতী, তবু একটি রাত্তিরেও রেহাই মিলত কি? আর গৌতমের সম্ভোগ মানে নিছকই ভোগ। স্বাতীর ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা নেই, নারী-পুরুষের মিলনের স্বাভাবিক ছন্দের বালাই নেই, শুধু পশুর মতো শরীরটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাওয়া। এক একসময়ে হয়তো ওই বন্যতা ভাল লাগে, তা বলে রোজ রোজ?

এখনও বোধহয় কামে পুড়ছে গৌতম। কেন যে ফের একটা বিয়েটিয়ে করে নিল না? উফ্, তাহলে কত দিক দিয়ে যে স্বাতীর স্বস্তি মিলত। দ্বিতীয় বিয়েতে বাচ্চাকাচ্চা হয়ে গেলে তাতানকে নিয়ে এই কুৎসিত জেদাজেদিটার হয়তো অবসান ঘটত। দু'নম্বর বউটাও নিশ্চয়ই তাতানকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ির আদিখ্যেতা পছন্দ করত না, এবং স্বাতীর কাছে তাতানকে ঘন ঘন পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করত খানিক।

যাক গে যাক, যা হয়নি তা ভেবে স্বাতীর এখন কী ফয়দা? বরং সে কী করবে, সেটা চিন্তা করাই তো শ্রেয়। গৌতমকে আবার ফোন করে গালাগালের ফোয়ারা ছোটাতে পারে স্বাতী, কিন্তু তাতে তো তাতানকে পাওয়া যাবে না। তাহলে...? গৌতমের হালচাল যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে তো মনে হয় ছেলেকে চিরতরে হারানোটাই স্বাতীর ভবিতব্য।

মাগো, ভাবলেই বুকটা টনটন করে। নাহ্, স্বাতী পারবে না, তাতানকে হারাতে হলে স্বাতী মরেই যাবে। তার চেয়ে বরং যে কোনও মূল্যে গৌতমের সঙ্গে একটা সমঝোতা করা যায়....! চোখকান বুজে, ঘেন্নাপিত্তির মাথা খেয়ে সে যদি নির্জনে গৌতমের সঙ্গে দেখাই করে...! সে নয় গৌতমের হাতেপায়ে ধরে বোঝাবে। নয় নয় করে প্রায় সাড়ে ছ' বছর তার সঙ্গে ঘর করেছিল গৌতম, সেই বউয়ের জন্য গৌতমের মনের কোণে একটু করুণাও কি নেই? একেবারে মায়াদয়া ভালবাসাহীন লোক তো ছিল না গৌতম। স্বাতীর সামান্য জ্বরজারি হলেও কী উতলা হয়ে পড়ত...তাতান যখন হল, স্বাতীকে ঘুমোতে দিয়ে রাত জেগে দেখভাল করত ছেলের। সেই গৌতম যে আমূল বিগড়ে গেল, তার মূলে গৌতমের মা'টির তো অবদান কম নয়। স্বাতী ফের চাকরিতে ঢোকার পর রোজ ছেলের কান ভাঙাচ্ছে, তাকে উত্তেজিত করছে...। কেন ফের স্বাতী চাকরিতে ঢুকল? স্বাতীর আদৌ চাকরি করারই বা কী দরকার? সেই চাকরিও এমন, যাতে রোজ রাত করে ফিরতে হবে? টিভিতে চাকরি মানেই দিনরাত পুরুষদের সঙ্গে গা ঘষাঘষি, এতে কি ঘরের বউয়ের চরিত্র ঠিক থাকে? সারাক্ষণ এইসব শুনলে গৌতমের মতো তামসিক মেজাজের মানুষ যে ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এত বছর পর সেই উন্মত্ত রাগে হয়তো

পলি পড়ে গেছে। এখন যা চলছে, তা তো নিতান্তই স্বাতীকে হেয় করার চেষ্টা। স্বাতী যদি রণকৌশল হিসেবে ছেলের জন্য মাথা খানিক নত করে, ক্ষতি কী?

হ্যাঁ, গৌতমের মুখোমুখি হবে স্বাতী। উসকে দেবে দু'-এক পিস মধুর স্মৃতি। সঙ্গে সঙ্গে বোঝাবে, গৌতমের দাবিটা অনৈতিক, স্বাতী এখন পরস্ত্রী। এ ধরনের হীন কাজে লিপ্ত হওয়াটা গৌতমকে মানায় না। নয় একটু কেঁদেই নেবে স্বাতী। চোখের জলেও কি কব্জা করতে পারবে না গৌতমকে?

কিন্তু সব প্রয়াসই যদি ব্যর্থ হয়? তোয়ালেয় গা মুছতে মুছতে স্বাতী আয়নায় নিজেকে দেখল। না হয় দিয়েই দেবে এই শরীরটা! কী আছে আর এই ছত্রিশ বছরের দেহে? সে তো কুমারীত্ব খোয়াচ্ছে না। এমন কিছু পরপুরুষও তো নয় গৌতম। একদিন তার সঙ্গে বিছানায় শুলে এ দেহ অশুচি হয়ে যাবে, এ ধরনের মধ্যযুগীয় ধারণাও তো অর্থহীন। না হয় স্বাতী ধরেই নেবে, তাতানকে পেতে শরীরটাকে সে ব্যবহার করছে! সন্তানকে কাছে পাওয়ার জন্য মার কোনও কাজেই পাপ হয় না।

তবে এবার থেকে তাতানের সঙ্গে দেখা হলে তার মগজ ধোলাই করতে হবে নিয়মিত। যাতে সে ক্রমশ ওই খড়দার বাড়িটাকে ঘেন্না করতে শেখে। বিশেষত ওই ঠাকুমাটিকে। স্বাতীর তরফ থেকে সেটাই হবে যোগ্য প্রতিশোধ।

এতক্ষণে স্বাতী যেন হালকা বোধ করল খানিকটা। নাইটি গলিয়ে বেরোল বাথরুম ছেড়ে। চুল আঁচড়ে ড্রয়িংহলে এসেছে। টিভি চালিয়েছে প্রতীক। ডিসকভারি চ্যানেল। দেখছে আফ্রিকার জঙ্গলে হাতিরা কীভাবে দেশান্তরী হয়। তিতলি লেপ্টে আছে বাবার সঙ্গে। সেও হাতির পাল দেখছে বড় বড় চোখে।

স্বাতী বলল,—কী গো, দশটা তো বাজে, মেয়ে ঘুমোবে না?

—আর পাঁচ মিনিট। তারপর শোওয়াচ্ছি। চোখ না ফিরিয়েই বলল প্রতীক,—তুমিও বসো। দ্যাখো। দারুণ ইন্টারেস্টিং।

—তুমিই দ্যাখো। আমায় খাবারদাবার গরম করতে হবে।...সবিতা কি স্যালাড কেটে রেখে গেছে?

—সম্ভবত না। আমিই বারণ করেছিলাম। যা গরম চলছে, শসা পেঁয়াজ বেশি আগে কেটে রাখা ঠিক নয়।

—ভাল। মহারানির আর একটা কাজ কমেছে।...যেভাবে ওকে মাথায় তুলছ, এরপর নামানো মুশকিল হবে।

আলগা অসন্তোষটুকু ছুড়ে স্বাতী সোজা রান্নাঘরে। শসা পেঁয়াজ টোম্যাটো কাটছে একে একে। লেবু চিপে নুন দিয়ে মাখল স্যালাড। ফ্রিজ থেকে খাবার বার করে রান্নাঘরের স্ল্যাবে এনে রাখল। ঠাণ্ডা ভাবটা কাটুক, তারপর মাইক্রোওয়েভে ঘোরাবে। সবিতার বানানো ফ্রায়েড রাইসটা দেখল একবার। অনেকটাই আছে, তিতলির জন্য তুলে রাখবে কি? নাহ্, মেয়েকে বাসি জিনিস বেশি না খাওয়ানোই ভাল। বরং তারাই দুজনে ভাগাভাগি করে রাতে শেষ করে দেবে বাকিটুকু।

রাত্রে খেতে বসে প্রতীক বলল,—আমি একটা কথা ভাবছিলাম, বুঝলে।

স্বাতী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

প্রতীক চোখে একটু কায়দা করে বলল,—একটা গাড়ি কিনলে বেশ হয়, তাই না?

—হঠাৎ এমন বাসনা?

—গাড়ি থাকলে কত সুবিধে, বলো। তোমাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসবে, নিয়ে আসবে। ভিড় ঠেলা থেকে তোমার মুক্তি। মাঝের সময়টা আমি ব্যবহার করব।

—আমার ফেরার কোনও ঠিকঠিকানা থাকে নাকি?

—তেমন হলে জানিয়ে দেবে। যাবে না গাড়ি। বেশি রাত হলে অফিসই তো তোমাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে যায়।

—তা যায়। তবে আবার একটা এক্সট্রা খরচা। এমনিই তো ফ্ল্যাটের লোন চলছে।

—ধারবাকিতে যাব না, স্ট্রেট কিনে নেব। প্রতীক একগাল হাসল, —নতুন নয়, সেকেন্ড হ্যান্ড। লাখখানেকের মধ্যে।

—কিন্তু এক্সপেন্স তো বাড়বেই। ড্রাইভার, তেল...

—অত পিটির পিটির কোরো না তো। প্লাস পয়েন্টগুলো একবার ভাবো। ইচ্ছে হলে ছুটিছাটার দিন মিনি আউটিংয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে...

—আমার আবার ছুটিছাটা!

—আরে বাবা, তেমন হলে ফ্রেঞ্চ লিভ নেবে। পেটখারাপ, ভাইরাল ফিভার, কত কী আছে...

—যখন সত্যি সত্যি সেগুলো হবে?

—তখনও নেবে। প্রতীক মুচকি হেসে চোখ টিপল,—রোজ রোজ তুমি এত কাহিল হয়ে ফেরো, দেখতে যে আমার কী খারাপ লাগে!

প্রতীক ঠাট্টার ছলেই বলছে কথাগুলো। তবে মানুষটা যে স্বাতীর সুবিধে-অসুবিধের ওপর প্রখর নজর রাখে, এ তো স্বাতীর অজানা নয়। বিয়ের আগে থেকেই তো দেখছে।

স্বাতী অফিস থেকে বেরনোর পর তাদের দেখাসাক্ষাৎ হত তখন। সবে ডিভোর্সের মামলা শেষ হয়েছে, তাতানের কাস্টডি না পেয়ে স্বাতী তখন সর্বক্ষণই মনমরা। কী করে যেন প্রতীক ধরে ফেলত, পার্কসার্কাস থেকে ময়দান একা একা যেতে বুকটা হু হু করবে স্বাতীর। প্রতীক তখন থাকত টালিগঞ্জে, ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে। রাতে মেট্রোরেল বন্ধ হয়ে গেলে দমদম থেকে সারা শহর উজিয়ে টালিগঞ্জ ফেরা খুব সোজা নয়। তবু প্রায় নিয়মিতই সে সঙ্গী হত স্বাতীর। কী ভরসাই না জোগাতে পারে মানুষটা! বাপের বাড়িতে নিরন্তর চাপ, মনের ভেতর খাঁ খাঁ শূন্যতার বিপুল বোঝা—পাশে প্রতীক না থাকলে স্বাতীর যে কী হত তখন! বিয়ের পরও স্বাতীর মনটাকে চাগিয়ে রাখার চেষ্টায় এতটুকু ভাটা পড়েনি। পাকা চাকরি নেই, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিবেশ সংক্রান্ত লেকচার, সেমিনার, ওয়ার্কশপটাই যা নিয়মিত রোজগার। মাঝে মাঝে পরিবেশ নিয়ে শর্টফিল্ম, ডকুমেন্টারিও করে অবশ্য। কাজের গুণে কোনও কোনওটা চড়া দামেও বিকোয়। এছাড়া একটা এনজিও চালায়, প্রায় একা হাতে। সব মিলিয়ে যথেষ্ট অনিশ্চিত জীবন, তবু তো ঝুঁকি নিয়ে এই ফ্ল্যাটখানা কিনে ফেলল! স্বাতী একটা পাকা চাকরি নিয়ে পাশে আছে ঠিকই, তবু মূল সাহসটা তো প্রতীকেরই। স্বাতীর দোনামোনা ভাব অগ্রাহ্য করেই তো এগিয়েছিল! কেন

এগিয়েছিল? নিজেদের একটা আস্তানা হলে স্বাতীর মানসিক স্থিতি বাড়বে, এই ভেবেই না! কী আশ্চর্য, নতুন ফ্ল্যাট পেয়ে সত্যিই তো অনেকটা মন ভাল হয়ে গেল স্বাতীর!

শুধু কি তাই? তাড়াতাড়ি একটা বাচ্চা চেয়েছিল প্রতীক, সেও তো স্বাতীর কথা ভেবেই। তিতলিকে পেয়ে, খানিকটা হলেও তাতানের শোক তো স্বাতী ভুলতে পেরেছিল। এই প্রতীকের কাছে তার কত যে ঋণ জমছে।

গৌতমের ওই অসভ্য আবদারকে প্রশ্রয় দেওয়াটা কি প্রতীককে এক ধরনের ঠকানো নয়? বিয়ে তো এক সামাজিক চুক্তি। কাজটা যে চুক্তিভঙ্গেরই শামিল।

খেয়েদেয়ে উঠে রান্নাঘর গোছাতে গোছাতে স্বাতী ভাবছিল কথাগুলো। প্রতীককে বলবে গৌতমের ব্যাপারটা? রেখেঢেকে...কায়দা করে...? প্রতীক তো ঘোরতর যুক্তিবাদী, পরিস্থিতির চাপে পড়ে স্বাতীকে একটা খারাপ সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে, এ কি প্রতীক বুঝবে না? তাছাড়া প্রতীক মোটেই নীতিবাগীশ নয়, মা হিসেবে স্বাতীর অসহায়তা সে তো অনুভব করতেও পারে।

যাহ্, কী আষাঢ়ে চিন্তা ঢুকল মাথায়? অহংয়ে মটমট স্বামী না হোক, প্রতীক পুরুষ তো বটে। আগের বরের সঙ্গে স্বাতী একান্তে দেখা করবে, এটা হজম করা দুনিয়ার কোনও পুরুষের পক্ষে কি সম্ভব?

তাহলে কি স্বাতী গোপনেই সারবে কাজটা? কিন্তু...

প্রতীককে একবার বাজিয়ে দেখলে কেমন হয়?

মনে মনে কৌশলটা এঁচে নিয়ে স্বাতী ফের ড্রয়িংহলে। টিভি বন্ধ, প্রতীক ল্যাপটপ খুলে কী যেন করছে। পাশে বসতে বসতে স্বাতী বলল, —এখনও কি তোমার স্ক্রিপ্ট ঘষামাজা চলছে?

উত্তর নয়, একটা আবছা ধ্বনি,—উঁ?

—বলছি, এত কী জটিল কাজ, যে এখনও চিত্রনাট্য তৈরি শেষ হচ্ছে না?

—আছে আছে, ঝামেলা আছে। একটা গল্পের ফর্মে সাজাচ্ছি তো।

—ক'দিন শুটিং চলবে? ক্যামেরায় কে থাকছে? সেই রাকেশ বলে ছেলেটা?

প্রতীক তেরচা চোখে তাকাল ক্ষণকাল। তারপর ঝটিতি বন্ধ করে দিয়েছে ল্যাপটপ।

স্বাতী অবাক মুখে বলল,—কী হল? কাজ শেষ?

—আজকের মতো। ল্যাপটপখানা ভাঁজ করে সেন্টারটেবিলে রাখল প্রতীক। সোফায় হেলান দিয়ে বলল,—এবার উত্তরগুলো শোনো। শুটিং শিডিউল চারদিনের। আমি নদিয়ার আউটডোরের কথা বলছি। এছাড়া ইনডোরে তিনদিন তো লাগবেই। ক্যামেরায় এবার রাকেশ নয়, থাকছে একটু নতুন ছেলে। গীতঙ্কর রায়। সবে সত্যজিৎ রায় ইনস্টিটিউট থেকে পাস করেছে। আর কিছু জানতে চাও? কাস্টিং কী করছি? তাহলে বলি, লোকাল পিপল নিয়েই কাজ করব। প্রফেশনাল আর্টিস্ট থাকবে একজনই। থিয়েটারের। সরল সেন। এরপর ধরো আসছে এডিটিং আর মিউজিক...

—হয়েছে, হয়েছে। স্বাতী হেসে ফেলল,—এবার থামো। আসলে আমি একটা অন্য কথা বলতে চাইছিলাম।

—সে তো বুঝেই গেছি। নইলে সোজা বিছানায় না গিয়ে আমার কানের কাছে ট্যাকট্যাক শুরু করবে কেন? প্রতীক নড়ে বসল,—কী কেস?

—অফিসে আজ একটা পিকিউলিয়ার কাণ্ড শুনলাম। এক ভদ্রলোক, আমাদেরই বয়সী, ডিভোর্সের পর আবার সংসার পেতেছিল। সেকেন্ড ম্যারেজে তার একটা ইস্যুও আছে...। প্রথম বিয়েতে ভদ্রলোকের একটা মেয়ে হয়েছিল। সেই মেয়ে নাকি ভদ্রলোকের প্রাণ। মেয়ে মার কাছেই থাকত। মহিলাটি নাকি বহুৎ টেঁটিয়া, বাপকে মেয়ের কাছে ঘেঁষতে দিত না। ফের বিয়ে-থা করেনি তো, একটু খ্যাপা খ্যাপা মতোন হয়ে গেছে। এখন মেয়েকে দেখতে দেওয়ার নাম করে ফের পুরনো বরের ঘাড়ে চেপেছে মহিলা। ভদ্রলোকের হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলা দশা। না পারছে গিলতে, না পারছে উগরোতে। এদিকে দ্বিতীয় বউটার কী হাল ভাবো?

—আমার তো মনে হয় প্রবলেম কিছু নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি বিশ্বাসের ভিত পোক্ত থাকে, তাহলে দা সেকেন্ড লেডি ক্যান সিম্পলি ইগনোর দা ব্যাপার।

—যাহ্, কোনও বউ তা পারে নাকি?

—না পারার তো কারণ দেখি না। ভদ্রমহিলার বোঝা উচিত, তার স্বামীর একটা আলাদা সত্তাও আছে। অ্যাজ ফাদার অফ এ ডটার। সেই সম্পর্কটা বজায় রাখতে গিয়ে ভদ্রলোককে যদি কোনও কম্প্রোমাইজ করতে হয়, সেটা মেনে নেওয়াটাই র‍্যাশনাল কাজ। অকারণ ইমোশান দেখিয়ে স্বামীর জীবনটাকে বিষিয়ে দিলে তারও তো কোনও লাভ নেই। বাই দা বাই, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কি তার ফার্স্ট ওয়াইফের ফের মেন্টাল রিলেশানও তৈরি হয়েছে?

—তা বলতে পারব না। তবে দু'জনকে নাকি যত্রতত্র একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

—তোমাকে গল্পটা কে শোনাল?

হোঁচট খেল স্বাতী। ঢোক গিলে বলল,—আমার এক কলিগ। তারই মাসতুতো বোন ভদ্রলোকের সেকেন্ড ওয়াইফ।

—সে জানে বোন আর বোনের বরের রিলেশানটা কেমন?

—তার মতে...সেই আগের বউটা ফিজিকাল আর্জ মেটাচ্ছে। বর আসলে মন থেকে তার বোনটাকেই এখন ভালবাসে। শুধু ওই ডাইনিটার উৎপাতই তাকে বড় আপসেট করে দিচ্ছে।

—কোনও মানেই হয় না। সে যখন জানেই তার বর তাকেই এখনও ভালবাসে, ফালতু কেন আগের ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে!

—বলা সহজ মশাই। অ্যাকচুয়াল সিচুয়েশানে পড়লে কে যে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে তা কি কেউ বলতে পারে? স্বাতী জোর করে ঠোঁটে চিলতে হাসি ফোটাল,—ধরো গৌতমই আমায় বলল, ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আমার সঙ্গে তোমাকে শুতে হবে। আর আমিও তাতান তাতান করে উদভ্রান্ত হয়ে তার খাঁই মেটাতে ছুটলাম। কেমন লাগবে তোমার?

প্রতীক ভুরু কুঁচকে তাকাল,—গৌতম তোমায় এসব বলেছে নাকি?

—যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও।

একটুক্ষণ ভাবল প্রতীক। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,—ওয়েল... আমার তো মনে হয় আমি ব্যাপারটা স্পোর্টিংলিই নেব। কারণ বিয়ে করেছি বলেই আমি তোমার শরীরের মালিক নই। কখন কোথায় কীভাবে তুমি

তোমার শরীর ব্যবহার করবে, সে সম্পর্কে তোমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আমাদের পারস্পরিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি ঠিকঠাক থাকে, তাহলে তোমার পারসোনাল সিদ্ধান্তে আমি নাক গলাব কেন।

প্রতীকের কথাগুলো কি একটু কৃত্রিম শোনাল? স্বাতীর ধন্দ জাগছিল। ওই কথার সূত্র ধরেই স্বাতী তামাশা জুড়বে কী? ভরসা পেল না। বুকটা কেমন ধড়াস ধড়াস করছে। হঠাৎই।

প্রতীক ঘুরে বসেছে। সিরিয়াস মুখ করে বলল,—যাক গে, হাইপথিটিকাল আলোচনা ছাড়ো, এবার একটু কাজের কথা হোক।...তুমি কি গৌতমকে আর ফোন করেছিলে?

মুখ দিয়ে হ্যাঁ প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল, কোনওক্রমে গিলে নিয়ে স্বাতী বলল,—না...। না তো।

—গুড। আর করার দরকারও নেই। স্বাতীর পিঠে হাত রাখল প্রতীক, —তোমার প্রবলেম, ওদের অ্যাটিচিউড, এসব নিয়ে অনেক ভাবলাম। না, তুমিই ঠিক। আবার কোর্টে যাওয়া ছাড়া রাস্তা নেই।

আচমকা এই প্রস্তাবটার জন্য স্বাতী এই মুহূর্তে প্রস্তুত ছিল না। আমতা আমতা করে বলল,—তাতে সত্যিই লাভ আছে কি?

—দেখা যাক। অন্তত উকিলের সঙ্গে তো কথা বলি। কাল তুমি একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবে কি? অ্যারাউন্ড সাড়ে সাতটা, আটটা?

—চেষ্টা করতে পারি।

—কাছেই কসবায় আমার এক বন্ধু আছে। আলিপুর কোর্টে প্র্যাকটিস করছে। উই ক্যান টক টু হিম টুমরো। আমি কাল ভোরে বেরোব, চলেও আসব। কিগো, যাবে?

স্বাতীর স্বর ফুটল না। তবু ঘাড় নেড়ে দিল। কেন যে নাড়ল? উল্টো কোনও বিপত্তি ঘটবে না তো?

ছয়

দাওয়ায় শতরঞ্চি পেতে দিয়েছে নজর আলি। তার ওপরে বসে চতুর্দিকে রাশি রাশি চিরকুট ছড়িয়ে চলছে প্রতীকের হিসেবপত্র। মিলছে না। মিলেও মিলছে না। প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকার ফারাক। চার লাখ খরচে সাত হাজারের এদিক ওদিক হওয়া কোনও ব্যাপারই নয়। এটুকু গোঁজামিল দেওয়াই যায়। কিন্তু একবার গোঁজামিলের রাস্তা ধরলে আর কি সঠিক হিসেব পাবে ভবিষ্যতে?

গৌরাঙ্গ, এক্রাম, শশধররা দাওয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। প্রতীক চোখ তুলে বলল,—কী গো, গরমিল তো রয়েই যাচ্ছে! কোন খরচার কাগজটা দাওনি বলো তো?

মাঝবয়সী শশধর ঘাড় চুলকে বলল,—আজ্ঞা, সবই তো গুনেগেঁথে দিয়েছি কর্তা। নতুন বাছুর কেনার খরচও।

লোকগুলো পাইপয়সার হিসেবে গলতি করে না, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে প্রতীক। সুন্দরবনের এই বাদা অঞ্চলে কমদিন হল তো

আসছে না। নয় নয় করে প্রায় এক যুগ। এই কুয়েমুড়ি গ্রামেই তো এই নিয়ে পাঁচ বছর কাজ চলছে তার পূর্ব দিগন্তর। সেই আয়লার পর থেকেই। তারই পাঠানো রিপোর্ট আর ভিডিও ক্লিপিংয়ের ভিত্তিতে ঝড়ে ভেঙেচুরে যাওয়া এই গ্রামটাকে মেরামত করতে আগ্রহ দেখিয়েছিল এক ডেনিশ সংস্থা। তারাই বছর বছর টাকা পাঠায়। পূর্ব দিগন্তর মাধ্যমে। বাড়িঘর তোলার জন্য। প্রতীকই স্থির করে প্রতি বছর ক'টা বাড়ি উঠবে। কাজটা সুষ্ঠুভাবে করার জন্য গ্রামবাসীদের নিয়ে সভা করতে হয় মাঝে মাঝে। টাকাটাও সে সরাসরি তাদের হাতেই তুলে দেয়। স্থানীয় পঞ্চায়েতের এই নিয়ে কিঞ্চিৎ ক্ষোভও আছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার, যতই গরিব হোক, শিক্ষাদীক্ষা যতই কম হোক, টাকাপয়সা এরা নয়ছয় করে না বড় একটা। হয়তো গরিব বলেই করে না। হয়তো শিক্ষাদীক্ষা এখনও কম বলেই চোর হয়নি। বড় জোর কেউ কখনও লোভে পড়ে একটা সাইকেল কিনে ফেলল, কিংবা ছই সারিয়ে নিল নৌকোর। ব্যস, ওইটুকুই। তার বেশি নয়।

কিন্তু এবার হলটা কী? প্রতীক আবার গলা ওঠাল,—কী গো, তোমরা বলো কিছু। হিসেব না মিললে পরের বার আর টাকা আসবে না তো।

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। হঠাৎ এক্রাম বলে উঠল,—এক কাজ করেন কর্তা। এ বছর তো সাকুল্যে বিশখানা ঘর হল, আলাদা করে প্রতিটা ঘরের একবার হিসেবটা বলেন তো!

—সে তো বিস্তর সময় লেগে যাবে গো। প্রতীক ঘড়ি দেখল, —দেড়টা বেজে গেছে। আমাকে যে সাতটার মধ্যে কলকাতা ফিরতে হবে।

—তাহলে সামনের শনিবার আসেন। আপনাকে সেদিন বেশি বসতে হবে না। আমরা হিসেবপত্তর করেই রাখব।

তিলেক ভাবল প্রতীক। এখনকার মতো তো কাজ শেষ। এরপর বর্ষা এসে যাবে, কয়েক মাস এদিকে পাড়ি জমানো যাবে না। নয় সেদিন হিসেবের ছুতোতেই আরও একবার ঘুরে যাবে এই দ্বীপে। নদিয়ায় লোকেশান দেখতে যাওয়ার কথা আছে বটে, সেটা না হয় এক-দু'দিন পিছিয়েই দেবে। গীতঙ্করের সঙ্গে কথা বলতে হবে একবার, ওকেও তো ফাঁকা পাওয়া দরকার।

প্রতীক আড়মোড়া ভেঙে বলল,—তাই হোক তবে। দেখো, সেদিন কিন্তু আমায় ডুবিও না।

নজর আলি উঠোন থেকে তাড়া লাগাচ্ছে সবাইকে,—অ্যাই, এবার তোমরা এসো। কর্তাকে দু'-চারটে দানাপানি মুখে তুলতে দাও।

একে একে চলে যাচ্ছে ছোট্ট দলটা। নজর আলির বউ উঁকি দিল দরজায়। একটু লজ্জা লজ্জা মুখে বলল,—গাঙের পানি ধরা আছে, গোসল করে নিতে পারেন।

গুছিয়ে একটা স্নান সারতে পারলে ভালই লাগত প্রতীকের। সেই কোন ভোরে গায়ে জল ঢেলে বেরিয়েছে, তপ্ত নোনা বাতাসে চিটপিট করছে শরীরটা। কিন্তু সময় নেই। মথুরাপুর যেতে ঘণ্টা দুয়েক তো লাগবেই। তারপর ট্রেনে বালিগঞ্জ তো আরও দেড়। না না, আজ দেরি করার জো নেই। স্বাতীকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে, যদি মথুরাপুর থেকে সওয়া পাঁচটার ট্রেনটা মিস করে তাহলে কেলেঙ্কারি।

প্রতীক হেসে বলল,—না গো রাবেয়া, গোসলটা আজ বাদই থাক।

—তাহলে বসে যান। আসন করে দিচ্ছি।

—নজরও আমার সঙ্গে খাবে তো?

—কী যে বলেন কর্তা! অতিথ মানুষের সঙ্গে বসা কি শোভা পায়?

প্রতীক পীড়াপীড়িতে গেল না। কুয়েমুড়িতে এলে কারোর না কারোর বাড়িতে দুপুরের অন্ন তার জুটেই যায়। তবে গ্রামবাসীদের সংকোচটাও সে বোঝে বৈকি। জোর করে নিজেকে এদের সমপর্যায়ভুক্ত করার কৃত্রিম প্রয়াসে তার আগ্রহও নেই। সে তো রাজনীতির লোক নয়, শৌখিন মজদুরি তার পোষায় না।

শোওয়ার ঘরেই আহারের আয়োজন। কাঁসার থালায় মোটা মোটা লাল চালের ভাত, কাঁসার গ্লাসে জল। বোধহয় বংশপরম্পরায় এই কাঁসার বাসন এখনও রয়ে গেছে গরিব ঘরে। প্রতীকের মতো শহুরে লোকজন এলে আপ্যায়নের জন্য বেরোয়। বাড়িতে স্বাতীর পছন্দমতো বাঁশকাটি চাল আসে, তবে এই ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাতটি মন্দ লাগে না প্রতীকের। বেশ একটা মিঠে মিঠে স্বাদ। পেঁয়াজ রসুন দিয়ে পাতলা মসুরির ডাল করেছে

রাবেয়া, সঙ্গে কুমড়ো আলু ঝিঙে পটল দিয়ে একটা ঘ্যাঁট। একখানা ওমলেটও ভেজেছে। বোধহয় তারজন্য বিশেষ বন্দোবস্ত।

পেটে চনমনে ক্ষিদে, তরিজুত করেই খাচ্ছিল প্রতীক। একটু যেন অন্যমনস্কও হয়ে পড়েছিল। রাজডাঙার সাজানো গোছানো ফ্ল্যাটের বদলে এক গরিবস্য গরিব চাষির কুঁড়েঘরে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে দুপুরের ভোজন সারছে, দৃশ্যটা নিজের কাছেই কেমন অলীক অলীক ঠেকে। ক' বছর আগে এই অনুভূতিটা জাগত না। বিয়ে-থার পর একটা সুখী গৃহকোণের নিশ্চিন্ততা কি তার মধ্যে বদল ঘটাচ্ছে ক্রমশ?

—আর একটু ভাত দিই?

রাবেয়ার স্বরে প্রতীকের সম্বিৎ ফিরল। তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বলল, —না না, এটাই বেশি হয়ে গেছে।

—আমড়ার টক করেছি। খাবেন তো?

—দাও।...তোমার মেয়েদের আজ দেখছি না যে?

রাবেয়ার জায়গায় নজর আলি উত্তর দিল,—ইস্কুলে গেছে। গরমের ছুটির পর ইস্কুল খুলে গেছে কিনা।

—ওরা স্কুলে পড়ে বুঝি? মাদ্রাসায় যায় না?

নজর আলি জবাব দিল না। উত্তরটা বুঝে গেল প্রতীক। আজকাল মুসলমানরাও নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে বাচ্চাদের মাদ্রাসায় পাঠাতে চায় না। কীভাবে যেন বুঝে গেছে হিন্দুদের মতো স্কুলে গিয়ে বাংলা ইংরিজি শিখলে লাভ হবে আখেরে। তবে মুখে কিছু বলে না, পাছে মৌলবি টৌলবিরা চটে যায়। এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তাদের দাপট তো কম নয়।

খাওয়া শেষ করে বাড়ির পিছনে গিয়ে আঁচিয়ে নিল প্রতীক। অদূরে নদী দৃশ্যমান। দারুণ চওড়াও না, নেহাত সরুও নয়। কী যে নাম নদীটার? কেউ বলে মণি, কেউ বা বলে ঠাকুরানের শাখা। এখানে এত নদী বাঁক খেয়ে খেয়ে এর ওর তার সঙ্গে মিশেছে, সঠিকভাবে কিছু বলা মুশকিল। তবে রায়দিঘি থেকে ভুটভুটিতে চড়ে বসার পর নামটামের কথা আর মাথাতেই থাকে না। টিকটিক টিকটিক এগোচ্ছে ভুটভুটি, এ বাঁক ও বাঁক

ঘোরার পর এসে পড়ে বাদাবনে। সুন্দরী আর গরানে ক্রমে ছেয়ে যায় দু'দিকের পাড়। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গঞ্জ আসে, চলে সাইকেল নিয়ে নিত্যযাত্রীদের ওঠানামা, যেতে যেতেই ব্যাপারীরা ছইয়ের মধ্যে টোয়েন্টি নাইনের আসর বসায়...এসবের মাঝে প্রতীকেরও যেন কেমন ঘোর লাগা দশা। সাধে কি নেশার মতো ছুটে আসে প্রতীক! ওই ঘোরটাই তাকে বড় টানে যে। কতদিন আর আসা হবে কে জানে, কলকাতাতেই এত বেশি কাজে জড়িয়ে পড়ছে!

ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে প্রতীক নজর আলির দাওয়ায় ফিরল। ঝোলা কাঁধে তুলে এবার বেরিয়ে পড়ার পালা।

সদ্য ইট পড়েছে রাস্তায়। সামনে ভোট, পঞ্চায়েত একটু নড়ে বসেছে বোধহয়। আধপাকা রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রতীক দু'দিকটা দেখছিল। ইলেকট্রিকের পোস্ট রয়েছে মাঝে মাঝে। তবে ওই নামেই থাকা। সাকুল্যে বিশ পঁচিশটা বাড়ি ছাড়া এখনও বিদ্যুৎ আসেনি এদিকে। ডাইনে নদীবাঁধের ধারে এক প্রকাণ্ড জলাশয়। দেখে মনে হয় ঝিল, আদতে বানের জল উপচে এসে রয়ে গেছে জায়গাটায়। সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের পর পাঁচ বছর হয়ে গেল, মাটির নুন কাটেনি এদিকটায়, চাষবাসও হচ্ছে না বিশেষ। কী কঠিন জীবন!

একসময়ে এরকমই কোথাও একটা ঘর বেঁধে থেকে যাবে মনস্থ করেছিল না প্রতীক? ভাবতে গিয়ে প্রতীক নিজের মনেই হেসে ফেলল। জীবন যে কখন কোন দিকে মোড় নেয়! ইউনিভার্সিটির সেই মানালি নামের মেয়েটাকে বিয়ে করলে আজ সে কোথায় থাকত? নিউইয়র্ক? বোস্টন? শিকাগো? কে জানে! কেন যে তার প্রেমে পড়েছিল মানালি? একটু একটু দুর্বলতা যে প্রতীকেরও জাগেনি, তা তো নয়। লটঘট হয়তো একটা হয়েই যেত, কিন্তু সেই মেয়ে এত অ্যাম্বিশাস! কী লোভই না দেখাতে শুরু করেছিল, বাব্বাহ্! মনটাকে একটু স্থির কর প্রতীক, জি-আর-ইতে বোস, মোটামুটি একটা স্কোর কর, আমার বাবার রেফারেন্সে ঠিক ইউ.এস-এর কোনও একটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে এন্ট্রি পেয়ে যাবি। খরচ নিয়ে ভাবিস না, স্কলারশিপ তো পাবিই, বিয়েটা সেরে দু'জনে মিলে

পাড়ি দিলে বাকিটারও বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। কীভাবে হবে, মানালির আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাবাই জোগাবে কিনা, এসব প্রশ্ন আর প্রতীকের মুখে আসেনি। তবে বুঝতে পারছিল একটা ফাঁসকলে আটকে যাচ্ছে। কোনও ক্রমে হাতজোড় করে পালিয়ে বেঁচেছিল প্রতীক। প্রত্যাখ্যানের পর মানালির সেই শুকনো মুখটা...ওফ মনে পড়লে এখনও গা শিরশির করে। মানালি এখন টোকিওতে। এক সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের ঘরনি। বছর দুয়েক আগে দেখা হয়েছিল ইউনিভার্সিটির রিইউনিয়নে। দিব্যি ঝলমল করছে। সুখ উপচে পড়ছে যেন। বেদনার স্মৃতি কিছু আছে বলে তো মনেই হল না। সেভাবে জানতেও চাইল না প্রতীক এখন কী করছে। অথচ ওই মানালি খানিকটা হলেও প্রতীকের জীবনের অভিমুখ তো বদলে দিয়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়েটার সংস্পর্শে এসেই না গতানুগতিক অধ্যাপনা আর গবেষণার ইচ্ছেটা মরে গেল!

জীবনে এমন কত কী যে ঘটে! ঘর বাঁধার ইচ্ছেওলা মেয়ের থেকে শতহস্ত দূরে পালায়, আবার ঘরভাঙা মেয়েকে দেখে ঘর বাঁধার বাসনা জাগে। আষ্টেপৃষ্ঠে সংসারে জড়িয়ে পড়তে সাধ হয় বাউন্ডুলের। স্বাতীর সঙ্গে মোলাকাত তো নেহাতই চান্স ফ্যাক্টর। সুন্দরবনের ভূমিক্ষয় নিয়ে সেমিনারটায় সেদিন আমন্ত্রণই পায়নি প্রতীক। টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকেও তো অন্য একজনকে পাঠানোর কথা ছিল প্রোগ্রামটায়। শেষ মুহূর্তে প্রফেসার বিনোদ গোস্বামী অসুস্থতার ছুতোয় ঝুল দিলেন, অগত্যা এই বেঁড়ে বেটাকেই পাকড়াও করল উদ্যোক্তারা। স্বাতীও অন্যের বদলি ডিউটি করতে এল বেজার মুখে। সুন্দরবনের নদীজঙ্গল তো প্রতীক ভালই চেনে, তাই লেকচারটা বেশ জমিয়ে দিয়েছিল। শেষ হতেই কী হাততালির ধুম। ওই দেখেই না আলাদাভাবে তার ইন্টারভিউ নিল স্বাতী!

সেদিনই স্বাতীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে দুলে উঠল প্রতীকের বুক? কে যে হৃদয়ে সংকতে পাঠাল মেয়েটা পুরোপুরি নিরাশ্রয়? হ্যাঁ, নিরাশ্রয়ই তো। পরে স্বাতী গল্পও করেছে, বাপের বাড়িতে কী লাঞ্ছনা গঞ্জনাই না তাকে সহ্য করতে হয় রোজ। বলতে বলতে এক একসময়ে কেঁদেও ফেলত

স্বাতী। মা তাকে প্রতিনিয়ত দুষছে, দাদার মুখ ভার, বউদি তো প্রায় কথাই বলে না...। যেন বরের সঙ্গে কাটানছেড়ান করে স্বাতী এক মহাপাপী। পায়ের তলার মাটি, মাথার ওপরের ছাদ, দুটোই কেড়ে নিলে তবেই বুঝি সে যোগ্য শাস্তি পাবে।

এত সাতকাহন না জেনেই অবশ্য প্রথম দিন স্বাতীর মোবাইল নম্বর নিয়েছিল প্রতীক। কেন যে স্বভাববিরুদ্ধ কাজটা করেছিল? কেন যে আলাপ জমানোর ইচ্ছেটা কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি?

জীবনে সব কেনর উত্তর মেলে কই? স্বাতী তো এখন মনের মতোন সংসার পেয়েছে। বর মেয়ে নিয়ে তার কোনও অতৃপ্তি থাকার কথা নয়। তবুও সে কেন তাতান তাতান করে হেদিয়ে মরে? কাস্টডির মামলায় শৈথিল্য দেখিয়ে কেন এখন ছেলের অধিকার নিয়ে উতলা? কাল রাত্তিরে হঠাৎ ওরকম একটা আষাঢ়ে কাহিনিই বা শোনাল কেন? গৌতমকে ফোন করেছে কি করেনি তার জবাব দিতে গিয়ে তোতলামিরই বা কী অর্থ?

নাহ, অত সবকিছুর মানে খুঁজতে নেই। প্রতীক জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তা, সেখান থেকে আর এক, মগজ ক্রমশ মাকড়সার জাল হয়ে উঠছে যে! উঁহু, এ তো ভাল কথা নয়। স্বাতী তার ওপর নির্ভর করে, এইটুকুই তো যথেষ্ট।

বাঁধের রাস্তা শেষ। অনেকটা নীচে এক ফেরিঘাট। রায়দিঘি থেকে আসার সময়ে কুয়েমুড়ির যেদিকটায় নেমেছিল, এটা তার উল্টো প্রান্ত। এই ঘাট পেরিয়ে ওপারে গেলে সরাসরি অটো মেলে মথুরাপুরের। রাস্তাটা খুবই খারাপ, প্রায় ক্ষেতখামার ভেঙে যেতে হয় বিস্তর পথ। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। তবে সময় বাঁচে অনেকটা। তাছাড়া নদীপথে এখন রায়দিঘি ফেরা যাবেই না। জোয়ারভাটার ব্যাপার আছে যে।

ফেরিঘাটে ভুটভুটি ছাড়ছে। তাড়াতাড়ি পা চালাল প্রতীক। ফুরফুরে হাওয়া, ঘড়ঘড়ে ঝাঁকুনি, প্রমত্ত হুটোপুটি আর অসহ্য গাগাগাদির দীর্ঘ অভিযান সমাপ্ত করে অবশেষে বালিগঞ্জে যখন নামল, গ্রীষ্মের সন্ধে তখন দখল নিয়েছে মহানগরীর।

ওভারব্রিজে উঠতে উঠতে প্রতীক ফোন করল স্বাতীকে,—কীগো, তুমি কদ্দূর?

—এই তো বেরোচ্ছি।

—দেরি কোরো না। ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসো। আমি কসবার মুখটায় আছি।

উৎপলকে বলাই আছে, তবু একবার ফোন করে নিল প্রতীক। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করছে। বাস মিনিবাসের ধোঁয়া গিলতে গিলতে। স্বাতী অবশ্য আধঘন্টার আগেই এসে পড়ল। কাছেই উৎপলের চেম্বার, দু'জনে চলেছে হাঁটতে হাঁটতে।

যেতে যেতে স্বাতী বলল,—আজকে আমি সবিতাকে খুব বকেছি।

—কালকের ওই টিভি দেখা নিয়ে?

—নাহ্। হঠাৎ ছুটির বায়না জুড়ল...। বিপত্তারিণী ব্রত না কি যেন গুষ্টির পিণ্ডি আছে...। সামনের বৃহস্পতিবার আসা নিয়ে তাই ধানাইপানাই করছিল।

প্রতীক মুচকি হাসল,—বিপত্তারিণী ব্রত তো তোমার করার কথা। সবিতা না হয় তোমার বদলে...

—ফাজলামি কোরো না তো। আমি মরছি নিজের জ্বালায়!

—কাম অন স্বাতী। ব্রুড কোরো না। ডোন্ট লুজ ইওর হার্ট। ভেঙে পড়ার মতো কিছু হয়নি।

—তুমি তো জ্ঞান দিতেই পার। সমস্যাটা তো তোমার নয়।

বিরক্তির অভিব্যক্তি? নাকি হতাশার? স্বাতীর স্বরটা প্রতীক যেন ঠিক পড়তে পারল না। তবে বাকি পথটুকু আর বলল না কিছু। স্বাতীর পাশে পাশে হাঁটছে নীরবে।

উৎপল ঘোষালের পশার ভালই। দোতলা পৈতৃক বাড়ি, একতলায় এয়ার কন্ডিশন্ড চেম্বার, ক্লার্ক টাইপিস্টদের বসার জায়গা আছে, অপেক্ষারত মক্কেলদেরও। ঢুকেই অন্দরে স্লিপ পাঠিয়েছিল প্রতীক, এক মক্কেল বার হতেই ডাক পড়ল তাদের।

গদিমোড়া ঘুরনচেয়ারে আসীন উৎপল। চল্লিশেই চকচকে টাক, গোল মুখে মক্কেল ভোলানো হাসি লেগে আছে এক ফালি। স্বাতীকে দেখে বুঝি আরও চওড়া হল হাসিটা,—আরে ম্যাডাম, আসুন, আসুন। প্রতীক ব্যাটা তো আমাকে বিয়েতে নেমন্তন্ন করেনি...তবু কপাল জোরে দেখা হয়ে গেল।

—কপাল জোরটা নিশ্চয়ই তোর? প্রতীক রসিকতা জুড়ল,—কপাল ভাল হলে কেউ তোদের ছায়া মাড়ায় নাকি?

—দেখেছেন ম্যাডাম, এখনও চ্যাটাং চ্যাটাং বুলির অভ্যেসটা যায়নি! উৎপল একটা পেপার ওয়েট হাতে তুলে নিল। ঘোরাতে ঘোরাতে প্রতীককে বলল,—শোন, আমরা আছি বলেই এখনও মানুষ বিচার পায়।

—বকিস না। তোরা আইনের পুরুতগিরি করিস বলেই না কোর্টে যাওয়ার আগে মানুষ দশবার করে ভাবে।

দুই বন্ধুর হালকা রঙ্গতামাশার মাঝে চা এসে গেল। চুমুক দিতে দিতে উৎপল ক্রমশ সিরিয়াস। স্বাতীকে বলল,—প্রতীক আমায় মোটামুটি ব্যাপারটা বলেছে। আমাকে এখন কী করতে হবে?

স্বাতী মৃদুস্বরে বলল,—ছেলের সঙ্গে...যাতে নিয়মিত দেখা করতে পারি...

—আপনাদের জাজমেন্টের পেপারটা আমার একটু দেখা জরুরি। রিগার্ডিং ডিভোর্স, কাস্টডি...

—এনেছি। ঢাউস ভ্যানিটিব্যাগ খুলে সবজেটে কাগজের গোছাটা উৎপলকে বাড়িয়ে দিল স্বাতী। একটু যেন কাতর স্বরে বলল,—এখানে পরিষ্কার লেখা আছে, ছেলেকে দেখতে পাওয়ার রাইটটা খর্ব করা যাবে না।

—উম্।

ছোট্ট শব্দটুকু করে কাগজটা খুলেছে উৎপল। চোখ বোলাচ্ছে দ্রুত। ভুরুর ভাঁজ কমছে, বাড়ছে। ঝটাঝট উল্টোল পাতা।

পাঠ শেষ করে রায়ের কপিটা সামান্য সরিয়ে রাখল উৎপল। চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে বলল,—ঠিকই বলেছেন। একদম ক্লিয়ার ভারডিক্ট। ও পক্ষ সপ্তাহে একদিন ছেলেকে আপনার কাছে দিতে বাধ্য।

—কিন্তু দেয় না তো। অনেক ধরাধরি করলে মাসে দু'মাসে একদিন ছাড়ে। তাও ঘণ্টা খানেকের জন্য।

—ছেলের সঙ্গে ফোনে কথা পর্যন্ত বলতে দেয় না। প্রতীক বলে উঠল,—এই তো গত মঙ্গলবারই স্বাতীকে যা তা অপমান করে ফোন কেটে দিয়েছে। নেক্সট উইকে ছেলেটার বার্থডে, সেদিনও মার কাছে ছেলেকে আসতে দেবে না।

—হুম্। অতি অভদ্র পার্টি।...তা আপনি এখন ঠিক কী চান?

—ওই যে বললাম...

—সে তো আমি বুঝেছি। কিন্তু আমাকে এগজ্যাক্টলি কী করতে হবে?

স্বাতী যেন একটু থতমত খেয়েছে। বুঝতে পারছে না কী বলবে। প্রতীক তাড়াতাড়ি হাল ধরল,—তুই বল না কী করা উচিত।

উৎপল ঠোঁট কুঁচকোল,—তিনটে পন্থা আছে। প্রথমটা মাইল্ড। আমি অ্যাজ এ লইয়ার একটা চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাতে লেখা থাকবে, কোর্ট অর্ডার মানো, আমার ক্লায়েন্টকে হ্যারাস কোরো না। তাকে নিয়মিত ছেলের সঙ্গে মিট করানোর বন্দোবস্ত জারি রাখো। দ্বিতীয় রাস্তাটি একটু কড়া। কোর্টে সরাসরি পিটিশান। পার্টি কাস্টডির শর্ত মানছে না, ফ্রেশ অর্ডার করে তাকে মানতে বাধ্য করা হোক। আর তিন নম্বরটা পুরোপুরি যুদ্ধ। কোর্ট অর্ডার ভায়োলেশানের জন্য সোজা মামলা ঠুকে ছেলের কাস্টডি ডিমান্ড করা। সেখানে মেন্টাল টর্চারের গ্রাউন্ডও জুড়ে দেওয়া যাবে।

প্রতীক জিজ্ঞেস করল,—তুই কোনটা সাজেস্ট করিস?

উৎপল হাসল একটু। তারপর গম্ভীর ভাবে বলল,—দ্যাখ, পার্টি যদি মোটামুটি ভদ্রলোক হয়, তাহলে প্রথমটাই যথেষ্ট। তবে ভদ্র সভ্য হলে তো প্রবলেমটাই অ্যারাইজ করত না। সুতরাং প্রথম রাস্তাটি বেকার। দু' নম্বরটাতেও কতটা কাজ হবে, আমার সন্দেহ আছে।

—কেন? কোর্ট যদি ফের হুকুম দেয়, ওদের তো আর ট্যাঁ-ফো করার জায়গা থাকবে না।

—আরে দূর, কাস্টডি আর খোরপোষের কেসে এক একটা পার্টি যা

ছ্যাঁচড়া হয়...! আদালত তো রায় দিয়েই খালাস, সেটা এগজিকিউট করানো কি সোজা কাজ? কোর্টে পার্টি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ক্ষমা চেয়ে নিল, তারপর এক সপ্তাহ মানল, দু' সপ্তাহ মানল, ফের যে কে সেই। আবার আইনের দরজা খটখটাও। এরকম তুই কতবার করবি? পার্টি প্যাঁচোয়া হলে তোকে পাগল করে ছেড়ে দেবে।

স্বাতী ফ্যালফ্যাল মুখে শুনছিল। অস্ফুটে বলল,—তাহলে কি আবার কাস্টডির মামলাই করতে হবে?

—আমি সেটাও ঠিক সাজেস্ট করতে পারছি না ম্যাডাম। কারণ এই মামলাটা খুব সোজা নয়। আর্গুমেন্ট, কাউন্টার আর্গুমেন্ট চলতেই থাকবে। সেটা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। তারপর ধরুন লোয়ার কোর্টে হারল, সে যাবে আপার কোর্টে। সেখানেও হারলে আরও উঁচুতে...। ততদিনে আপনার ছেলেই হয়তো অ্যাডাল্ট হয়ে গেল।

প্রতীক অসহিষ্ণু স্বরে বলল,—তাহলে কি কোনও রাস্তা নেই?

—ফ্যামিলি ম্যাটারগুলো এরকমই রে। মানুষগুলো কেমন, তার ওপরে অনেকটাই নির্ভর করে।

স্বাতী করুণ সুরে বলল,—তার মানে ছেলেকে আমায় হারাতেই হচ্ছে?

—তা কেন? মা ছেলের বন্ধন কি ছেঁড়ে কখনও? বিশ বছর না দেখলেও ছেলে মার জন্য মুখিয়ে থাকবে। উৎপলের স্বরে এবার সান্ত্বনার প্রলেপ,—এক্ষুণি এক্ষুনি কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে না। দু'জনে ভাবুন। ডিসকাস করুন।

—আমি কিন্তু ছেলেকে চাই। ভীষণভাবেই চাই। ওই বাড়ির পরিবেশ থেকে ছেলেকে সরিয়ে আনতে না পারলে ওর লাইফ ঝরঝরে হয়ে যাবে।

উৎপলের মুখমণ্ডলে তেমন ভাবান্তর ঘটল না। এ ধরনের আর্তি শুনে শুনে বোধহয় তার কানের পর্দা পুরু হয়ে গেছে। শান্ত স্বরে বলল, —আমি আপনার ব্যথাটা ফিল করতে পারছি ম্যাডাম। মামলাও নয় করব। তবু বলছি, আর একবার ভাবুন। মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করে আমায়

জানান। আমি তো আছিই। আপনি প্রতীকের স্ত্রী, আমি আপনার ভাল ছাড়া মন্দ চাইব না।

উঠে বাইরে এসে প্রতীক একটা ট্যাক্সি ধরে নিল। অল্প পথ, তবুও। সিটে হেলান দিয়ে স্বাতীকে বলল,—কী গো, কী বুঝলে?

স্বাতীর মুখ থমথমে। গোমড়া গলায় বলল,—তোমার বন্ধু তো দায় এড়িয়ে গেল। কী করলে তাতানকে দেখতে পাব, বলতেই পারল না।

—ও তো আইনের লোক স্বাতী। আইনের ফ্রেমেই কথা বলবে।

—থাক, আমি বুঝে গেছি। তোমার বন্ধুটির কাছে আমায় না আনলেও চলত।

স্বাতীর প্রতিক্রিয়াটা কোথায় যেন বিঁধল প্রতীককে। হঠাৎ এত তাতান তাতান করছে কেন স্বাতী? তিতলি বেচারী একা থাকে, দিনভর মা-বাবাকে পায় না, তারজন্য স্বাতীর মন পোড়ে কই!

সাত

রবিবার অফিসে কাজের তেমন চাপ ছিল না স্বাতীর। সোমবার সকাল থেকে বেজায় ব্যস্ত। ডিউটি আওয়ার চুলোয়, সকাল ন'টার মধ্যে নাকেমুখে গুঁজে দৌড়তে হল অফিস। ক্যামেরাম্যান রাজর্ষি অপেক্ষা করছিল, তাকে নিয়ে ছোটো সেই পাইকপাড়া। সাহিত্যিক দীপেন মল্লিকের ফ্ল্যাটে। চটপট ইন্টারভিউ দিয়ে ছেড়ে দে তা নয়, খামোকা বসিয়ে রাখল আধঘণ্টা। অপরাধ, স্বাতীর পৌঁছতে নাকি দেরি হয়েছে। তারপরও প্রশ্ন করলে গুছিয়েগাছিয়ে উত্তর মেলে না, হুটহাট অন্য প্রসঙ্গে ঢুকে পড়ে। ছোট পত্রিকা থেকেই নাম করেছে, লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের নেতা ছিল এককালে, এখন অবলীলায় গাল পাড়ছে সাম্প্রতিক খুদে পত্রিকাগুলোকে। তাতে অবশ্য স্বাতীর কাঁচকলা। বিতর্কিত কিছু দেখালে পাবলিক আরও বেশি খাবে, চ্যানেলের টি.আর.পি বাড়বে...। কিন্তু অকারণে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল যে। পৌনে বারোটার মধ্যে কোনওক্রমে শেষ করে, পাইকপাড়ার পাট চুকিয়ে যেতে

হল সল্টলেক। কবি মীনাক্ষী মিত্র অবশ্য ঝোলায়নি, বাঁধাধরা জবাব দিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দিল।

তাও অফিসে ফিরতে ফিরতে দুটো। ক্ষিদে পেয়েছে জোর। আজ টিফিনও আনেনি স্বাতী। অন্য দিন সবিতা যা হোক কিছু বানিয়ে দেয়। কিংবা নিজেও কিছু করে নেয় স্বাতী। আজ সময় পেল কই? নীচের ক্যান্টিনটায় যাবে আজ? এ বাড়িতে আরও কয়েকটা অফিস আছে, তাছাড়া তাদের চ্যানেলেরও অনেকেই গিয়ে সেখানে খায়। টুকটাক নানান কিছু মেলে বটে, কিন্তু পরিবেশটা স্বাতীর তেমন পছন্দের নয়। বেশ অপরিষ্কার... পাঁচমেশালি ভিড়...

অন্ধকার অন্ধকার হলঘরখানায় টিফিন পাবলিক এখন একটু কম। কাউন্টারে রুটি তড়কার অর্ডার দিয়ে স্বাতী কোণার দিকের একটা টেবিলে বসল। মোবাইল বার করে ফোন করল নিয়মমাফিক,—কী সবিতা, সব ঠিকঠাক তো?

—তিতলি তো আজ খাচ্ছেই না বউদি। আমি হাঁপিয়ে গেলাম।

—সে কী? আড়াইটে বাজে!...কী দিয়েছ আজ ওকে?

—রোজ যা খায়। ভাত ডাল আলু ডিম বিন গাজর সব চটকে মিশিয়ে।

—বেশি করে ঘি দিয়েছ?

—হ্যাঁ।

পলক ভেবে স্বাতী বলল,—তিতলি আছে সামনে? ওকে দাও তো। কয়েক সেকেন্ডের নৈঃশব্দ্য। তারপরই তিতলির গলা কলকল,—হ্যালো? মা?

—হ্যাঁ, সোনা। তুমি খাচ্ছ না কেন বাবু?

—আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না। পেট ভরে গেছে।

—তা বললে কি হয়? সবটা তো খেতেই হবে।

—ইচ্ছে করছে না।

—ঠিক আছে, আমি সবিতামাসিকে বলে দিচ্ছি, সব ক'টা দলায় একটু করে টোম্যাটো সস মাখিয়ে দেবে। তাহলে খাবি তো?

তিতলি চুপ। হ্যাঁ বলবে, না খাব না বলবে বোধহয় ভেবে উঠতে পারছে না।

স্বাতী চিন্তা করার অবকাশ দিল না মেয়েকে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, খেয়ে দ্যাখো, খুব ভাল লাগবে। তারপর ভাতু শেষ করে একটা ঘুমু দাও। রাত্তিরে তাহলে তোমার জন্য একটা জিনিস নিয়ে যাব।

—কী?

—এখন বলব না। নিয়ে গেলে দেখতে পাবে। তুমি শুধু এখন লক্ষ্মী হয়ে থাকো, কেমন?...সবিতামাসিকে আবার দাও ফোনটা।

নির্দেশ শুনেই সবিতা হাঁ হাঁ করে উঠেছে,—সে কি গো বউদি? ওই ঘি ডাল ভাতে টোম্যাটো সস?

—আহ্, যা বলছি করো। বিকেলবেলা দয়া করে মেয়েটাকে নিয়ে একটু বেরিও। সারাক্ষণ বাড়িতে আটকে থাকলে ও কিন্তু ঘ্যানঘ্যানে হয়ে যাবে।

ফোনটা অফ করে স্বাতী পলক বিমনা। টোম্যাটো সস দিয়ে ভাত খাওয়াতে বলাটা কি উচিত হল? তারচেয়ে বরং কার্টুন চ্যানেলটা চালিয়ে দিতে বললে বোধহয়...। সেটাও তো নাকি খারাপ অভ্যেস। ডাক্তারবাবু তো বলেন বাচ্চাদের জোর করে গেলানোর দরকার নেই, ক্ষিদে পেলে ওরা আপনিই খাবে। কিন্তু যে মায়েরা বাচ্চা ফেলে চাকরিতে বেরোয়, ডাক্তারের ওই আশ্বাসে তাদের মন কি প্রবোধ মানে? কোথাও একটা অপরাধবোধ কুটকুট করে না কি? তাতানকে ফেলেও তো কাজে বেরিয়েছে স্বাতী, তখন অবশ্য ভাবনাটা ছিল না। বাড়িশুদ্ধু লোক এমনভাবে ঘিরে থাকত তাতানকে, সে খেল, কি খেল না এই চিন্তাটা আসতই না স্বাতীর মাথায়।

ফের তাতান ঢুকে পড়ল ভাবনায়? পরশু রাত্তিরে উকিলের চেম্বার থেকে ফেরা ইস্তক ছেলেকে প্রাণপণে সরিয়ে রাখছে মন থেকে। কাল একবারও বাড়িতে তাতানের প্রসঙ্গ উঠতে দেয়নি। তবু কোন রন্ধ্রপথে ছেলেটা যে এসে যায়! প্রতীক অবশ্য খোঁচাচ্ছিল। কাল রাতেও তো একবার জিজ্ঞেস করল, কী করবে স্বাতী। হাবভাবে মনে হয়, আবার কাস্টডির মামলা না করলে প্রতীক স্বস্তি পাবে। কিন্তু কেন? স্বাতী

পাকাপাকিভাবে তাতানকে ফিরে পাক, এটা কি প্রতীকের পুরোপুরি অভিপ্রেত নয়? তাতানকে কি গৌতমের সঙ্গে একই পাল্লায় ওজন করে প্রতীক? না না, প্রতীকের মন কখনই অত ছোট নয়। স্রেফ স্বাতীর হয়রানির কথা ভেবেই না প্রতীক...।

—কী রে, একা বসে কার ধ্যান করছিস?

সামনে বিতস্তা। স্পোর্টস নিউজের। টিনের চেয়ার টেনে বসেছে স্বাতীর মুখোমুখি। মজা করে বলল,—হঠাৎ আজ বি.পি.এল ভোজনালয়ে?

—এলাম। একটু মুখ বদলাতে ইচ্ছে হল।

—কী খাচ্ছিস? মোগলাই?

—না রে। পাঞ্জাবি খানা।

—তড়কা? ইশ, আমারও ওই নিলে হত। কেন যে ছাই টোস্ট ওমলেট বললাম?

—নো প্রবলেম। আমরা শেয়ার করব। স্বাতী অনেকটাই সহজ হয়েছে। হেসে বলল,—তোর ছেলের অ্যাডমিশানের কী হল?

—সে তো বহুৎ দেরি। নেক্সট ইয়ারে। পুজোর পর উঠেপড়ে লাগব। ছোট ছোট করে কাটা চুল ঝাঁকাল বিতস্তা। ঠাট্টার সুরে বলল,—রনিত অবশ্য মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। বহুৎ চেল্লাচ্ছে, এখন থেকেই নাকি ধরাধরি শুরু করতে হবে।

—কিসের ধরাধরি? তোর ছেলে তো পড়বে রামকৃষ্ণ মিশনে। ওখানে তো রিটন টেস্ট দিতে হয়।

—বটেই তো। তারজন্য তৈরিও তো করছি। কিন্তু রনিতের ধারণা ভেতর থেকে যোগাযোগ-টোগাযোগ না থাকলে...। বিতস্তা একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল,—ছাড় তো। সেলফিশ জ্যায়েন্টটাকে গলাতে পারলি?

গৌতমকে ওই নামটাই দিয়েছে বিতস্তা। স্বাতীর সঙ্গে তার অনেককালের পরিচয় কিনা। আগের বিয়ের অশান্তি, বিচ্ছেদ, স্বাতীর নতুন করে ঘরবাঁধা, তিতলি, তাতানকে নিয়ে টানাপোড়েন কিছুই তার অজানা নয়। প্রতীককে বিয়ে করার ব্যাপারে মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধা ছিল স্বাতীর, এই

বিতস্তাই তখন অনেক সাহস জুগিয়েছে। খেলার জগতে বিচরণ করতে করতে বেশ একটা খেলোয়াড় খেলোয়াড় ভাব এসে গেছে বিতস্তার। কোনও রং ঢং না করেই কথা বলে সরাসরি।

আজ হঠাৎ বিতস্তাকে পেয়ে ভাল লাগছিল স্বাতীর। মনপ্রাণের কথা কারোর সঙ্গে তো আলোচনা করতে ইচ্ছে করে।

ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে স্বাতী বলল,—কই আর। সে তো ভয়ানক বদমায়েশি শুরু করেছে।

—আবার কী করল? জন্মদিনে ছেলেকে তোর কাছে পাঠাবে না?

—সে তো আছেই। এখন আমার উইকনেসটা বুঝে খারাপ খারাপ প্রস্তাব দিচ্ছে।

—কীরকম?

বলতে গিয়ে হোঁচট খেল স্বাতী। কেমন যেন সংকোচ হচ্ছে। ক্যান্টিনের ছেলেটা রুটি-তড়কা রেখে গেছে টেবিলে। টোস্ট ওমলেটও। তাকে আর একখানা খালি প্লেট দিতে বলল স্বাতী। অর্ধেকটা তড়কা তুলে দিল বিতস্তাকে। কথা না বাড়িয়ে শুরু করেছে আহার।

বিতস্তা কিন্তু ভোলেনি। টুকরো ওমলেট মুখে পুরে বলল,—কী হল? চেপে গেলি যে?

—বলার মতো নয় রে। স্বাতীর ঠোঁটে ফ্যাকাসে হাসি,—ওকে সঙ্গ দিতে হবে?

—হোয়াট?

—ছেলেকে দেখতে হলে ওকে স্যাটিসফাই করতে হবে। ফিজিকালি।

—কী খচ্চর রে! হারামজাদার খুব পুড়কি জেগেছে বুঝি? চামচে তড়কা তুলে বিতস্তা চালান করল মুখে। ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল,—আগে তো এসব কখনও বলেনি?

—না তো। এই প্রথম।

—হঠাৎ এত বছর পর...আগের বউয়ের জন্য ছোঁকছোঁকানি...?

—ব্যাকগ্রাউন্ড একটা বোধহয় আছে। ক'দিন আগে গৌতমদের এক প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বাচ্চা মেয়ে...এখন অবশ্য বিয়ে-থা হয়ে

গেছে। কাল রাত্তিরে মেয়েটা ফোন করেছিল আমাকে। তখনই কথায় কথায় বলছিল, গৌতমের নাকি আবার বিয়ে করার সাধ জেগেছে, ওর মা উঠেপড়ে মেয়ে খুঁজছে, দোজবরে বলে নাকি পছন্দসই পাত্রী মিলছে না...। তখনই মনে হল, সম্ভবত ওইসব কারণেই...।

—খুবই সম্ভব। চল্লিশের আশেপাশে পুরুষদের লিবিডোটা হঠাৎ খুব বেড়ে যায়। দেখবি, এই বয়সের পর থেকেই পুরুষরা বেশি কেচ্ছাকেলেঙ্কারি ঘটায়। খেতে খেতে বিতস্তা থামল। চোখ সরু করে বলল,—তা গৌতম যে এমন একটা বাজে কথা বলল, তার জবাবটা তুই কী দিলি?

—আই ওয়াজ স্টান্ড। এমন ধাক্কা খেয়েছিলাম, মুখ দিয়ে কথাই বেরোল না।

—এই হল তোকে নিয়ে মুশকিল। এমন একটা সুযোগ হেলায় হারালি?

—কিসের সুযোগ?

—কতবার বলেছি, জীবনটা হচ্ছে টেস্ট ম্যাচের মতো। দেখে দেখে খেলবি, ভাল বল হলে ছেড়ে দিবি, বাউন্সার হলে ডাক করবি, কিন্তু লুজ ডেলিভারি পেলে নো মার্সি। তোর উচিত ছিল ওকে আইনের প্যাঁচে একেবারে বেঁধে ফেলা।

—লইয়ারের কাছে তো গিয়েছিলাম। প্রতীককে নিয়ে। সে তো কিছুই আশার বাণী শোনাল না। তাতানকে দেখাতে বাধ্য করার কোনও সোজা রাস্তাই নাকি নেই। যাই করতে যাই, প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হবে। টাইমও লাগবে বিস্তর।

—তুই গৌতমের প্রস্তাবটা উকিলকে জানিয়েছিলি?

—যাহ্, ও কথা উচ্চারণ করা যায় নাকি? প্রতীক শুনলেই বা কী ভাববে!

—এত হেজিটেশান বলেই তো তোদের বেশি ভুগতে হয়। তোর উচিত কী ছিল জানিস? স্ট্রেট থানায় গিয়ে একটা এফ.আই.আর লজ করে দেওয়া। আমার এক্স হাজব্যান্ড আমাকে কুপ্রস্তাব দিচ্ছে, নইলে বাচ্চাকে

দেখাবে না বলে শাসাচ্ছে...। মিডিয়ার লোক কমপ্লেন করলে পুলিশের চেপে যাওয়ার হিম্মত হয় না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওই গৌতম হুড়কো খেতই। আর তুইও প্যারালালি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের গ্রাউন্ড ফাউন্ড দিয়ে একটা ফৌজদারি মামলা ঠুকে দিতে পারতিস। খবরটা মিডিয়ায় এলে বাছাধনের কী হাল হত ভাব তো। নিজেদের এলাকায় আর মুখ দেখাতে পারবে? লাইফ হেল হয়ে যাবে না ব্যাটার?

বিতস্তা খুব ভুল কিছু বলেনি। চাইলে তো অনেক কিছুই করা যায়। গৌতমকে টেনে এনে শ্লীলতাহানির কেসেও তো জড়িয়ে দেওয়া যায়। সেটা তেমন কঠিন কাজও নয়। কিন্তু স্বাতী কি সেটা পারে? কাদা ছুড়লে নিজের গায়েও কি পাঁক লাগবে না? এমন একটা মুখরোচক ব্যাপার নিয়ে চারদিকে চর্চা হচ্ছে...ভাবলেই গা গুলিয়ে ওঠে। তাছাড়া প্রতীকই বা কী মনে করবে? তার মানসম্মানেও তো ধাক্কা পড়বে, নয় কি? সবচেয়ে বড় কথা, নিজের ছেলেকে জন্মদিনে কাছে পাওয়ার জন্য নোংরা ছলচাতুরি স্বাতী করবেই বা কেন?

স্বাতী বেজার মুখে বলল,—না রে, ওভাবে হয় না। আর ওসব করার মতো আমার স্ট্যামিনাও নেই।

—তাহলে আর কী, সাফার কর। নয়তো শয়তানটা যা বলছে, মেনে নে। বিতস্তা চোখ পাকাল,—আমি তোকে বলে দিচ্ছি স্বাতী, ওই সেলফিশ জায়েন্টকে প্রশ্রয় দিলে তোর কপালে কিন্তু দুঃখ আছে। তোকে ও ইচ্ছে মতন ইউজ করবে, ছেলেটাকেও তুই পার্মানেন্টলি হারাবি।

স্বাতী কি তা জানে না? সে কি চেনে না গৌতমকে? যে লোকটা রাতদুপুরে পাড়াপড়শিদের সামনে বউকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াতে পারে, তার সম্পর্কে কি কোনও পজেটিভ ধারণা সম্ভব? হ্যাঁ, সেদিন তাতানের কথা ভেবে একটু হয়তো দুর্বলতা জেগেছিল, সে তো স্বাতী ঝেড়ে ফেলেছে।

ঠাণ্ডা গলায় স্বাতী বলল,—তুই ঠিকই বলেছিস। গৌতমকে আমি কোনওমতেই ইন্ডালজ করব না। বরং কাস্টডির মামলাই নয় করব আর একবার।

—তাই কর তাহলে। আইনের সিধে রাস্তাতেই হাঁট। দ্যাখ এবার পথের শেষে কী আছে!

শুকনো হাসল স্বাতী। খাওয়া শেষ করে বিতস্তার সঙ্গে উঠে পড়েছে। মন্থর পায়ে ফিরল দোতলায়। চলে যাচ্ছে যে যার কাজে।

সকালের সাক্ষাৎকারগুলো নিয়ে ব্যস্ত হল স্বাতী। ইনজেস্ট থেকে বার করে বসল ভিডিও এডিটরের সঙ্গে। চলছে কাটাছেঁড়ার কাজ। মোট বত্রিশ মিনিট রেকর্ডিং থেকে বড় জোর মিনিট দশেক রাখা হবে। এটুকু ম্যাটার টানটান করাটা খুব জরুরি। প্রথম সাক্ষাৎকারের অনেকটা অংশই বিতর্কিত, সেটা পুরো রাখবে কি?

সিদ্ধান্ত নিতে ভরসা পেল না স্বাতী। কিসের থেকে কী হবে, কোন মানী লোক চটে যাবে? নিজের ঘাড়ে দায় না রেখে প্রোডিউসার রঞ্জনাদির সঙ্গে কথা বলা ভাল। বছর চল্লিশের রঞ্জনা চ্যানেলে প্রায় শুরু থেকেই আছে। একসময়ে নিউজ রিপোর্টার, অ্যাংকর, অনেক দায়িত্বই একা হাতে সামলেছে, এখন সে প্রায় কর্ত্রীর আসনে। প্রবীর মিত্রর প্রধান উপদেষ্টা।

স্বাতী রঞ্জনাকে খুঁজতে গেল। ঘরে নেই। কে এক রাজনৈতিক নেতা মারা গেছে, তাকে নিয়ে স্টোরি করা হবে, তাই নিয়ে মিটিং করছে প্রবীরের চেম্বারে। এবার গালে হাত দিয়ে বসে থাকো, যতক্ষণ না সে বেরোয়।

একটু নিরাশ মুখে স্বাতী ঘড়ি দেখল। চারটে পাঁচ। সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টা সময় দিয়েছে লিটল ম্যাগাজিন মেলার সম্পাদক, রাজর্ষি ফিরলেই তাকে নিয়ে রওনা হবে নন্দন চত্বরে। তার আগে কাজটা চুকিয়ে দিতে পারলে বাঁচা যেত। নয়তো সেই ডিউটি শেষ হওয়ার মুখে মুখে ফের স্ক্রিনিংয়ে বসো...। তখন হয়তো এডিটরের মুড থাকবে না, সে খ্যাচর খ্যাচর করবে। কী ঝকমারি, কী ঝকমারি!

ব্যাগে মোবাইল ফোন বাজছে। জিপ খুলে বার করতেই হালকা চমক। দাদা!

স্বাতী বোতাম টিপে বলল,—এই অসময়ে তুই যে?

—ব্যস্ত আছিস নাকি?

—খুব একটা না। কেন?

—একটা দরকারি কথা ছিল। বলছি। তার আগে বল তো, তুই এর মধ্যে একবার সময় করে আমাদের বাড়িতে আসতে পারবি?

—আমার তো টাইম মানে অফ ডে। বৃহস্পতিবার ছাড়া হবে না। কিন্তু এ উইকে সেদিন তো অন্য একটা কাজ আছে।

—ইন্য দ্যাট কেস, আমিও তোর বাড়ি চলে যেতে পারি। রোববার সকালে তুই কখন বেরোস?

—অ্যারাউন্ড এগারোটা।

—ও। তাহলে তো কোনও সমস্যাই নেই। সক্কাল সক্কাল পৌঁছে যাব, প্রতীকের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট সারব...

—সে তো খুব ভাল কথা। আয়। তবে ব্যাপারটা কী বল তো?

—তোর একটা সিগনেচার লাগবে রে খুকু।

—কেন? কোথায়?

—সেদিন তো শুনলি, মা আমার নামে বাড়িটা লিখে দেবে। তারই পেপার টেপার সব রেডি করছি। আমাদের ব্যাংকেরই এক লইয়ারকে দিয়ে। উনি বললেন, বোনকে দিয়ে একটা সই করিয়ে রাখুন।...আমি জানি তুই বাড়ির অংশ দাবি করবি না, তবু যদি কোথাও কোনও ডিসপিউট হয়...

—কিসের ডিসপিউট?

—দ্যাখ, বাড়িটা তো ঠিক মারও নয়। বাবার বানানো। সেই সূত্রে ইনহেরিটেড প্রপার্টি। বাবা কোনও উইলও করে যায়নি। অতএব আজকালকার আইন মতো তোর একটা অংশ তো থেকেই যায়। তুই নিচ্ছিস না...ঠিকই আছে। কিন্তু ভবিষ্যতে তোর ছেলেমেয়েদের তো খারাপ লাগতে পারে। ভাববে মামা মাকে ঠকিয়ে দিদিমার কাছ থেকে সব লিখিয়ে নিয়েছে। স্বপন শব্দ করে হেসে উঠল,—আমি বাপু তাদের চোখে ছোট হতে রাজি নই।

স্বাতী শ্বাস চেপে বলল,—চলে এসো তাহলে। রোববার।

—প্রতীককে বলে রাখিস। আমি ওর জন্য পয়োধি নিয়ে যাব। জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্নয় ওই আইটেমটা প্রতীক ভারি তৃপ্তি করে খেল, আমি দেখেছি।

—তোর চোখ তো খুব শার্প?

—হেঁ হেঁ হেঁ। তিতলি ভাল আছে নিশ্চয়ই?

—আছে।

—ছাড়ছি, অ্যাঁ?

ফোন অফ করতেই জমাট শ্বাসটা গড়িয়ে এল স্বাতীর বুক বেয়ে। মসৃণ কুশলতায় তার বাড়ির ভাগটুকু গিলে নিচ্ছে দাদা। স্বাতী বুক বাজিয়ে বলতে পারে, ওই বাড়ির প্রতি কোনও লোভ নেই তার। তবু স্বত্ব চলে যাওয়াটা কোথায় যেন তির হয়ে বেঁধে। যেন মনে হয়, জন্মসূত্রে এই পৃথিবীতে একটুকরো মাটি তার প্রাপ্য হয়েছিল, সেটাও কেউ কেড়ে নিল!

আর নিলটা কে? তার একান্ত আপনজন। ছোটবেলার কত অজস্র মধুর মুহূর্ত যে জড়িয়ে আছে দাদার সঙ্গে। সরস্বতী পুজোর দিন বাসন্তী রং শাড়ি পরে বেরোচ্ছে স্বাতী, বিনুনি ধরে হ্যাঁচকা টান দিল দাদা। স্বাতী ফোঁস করতেই দাদা হ্যা হ্যা হাসছে। মাধ্যমিকে অঙ্ক পরীক্ষা খারাপ হয়েছে, বাবা বকতেই স্বাতী ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল, ওমনি দাদা টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল বোনকে। হায়ার সেকেন্ডারির টিফিন টাইমে দাদা বোনের জন্য ডাব হাতে দাঁড়িয়ে। ঠোঁটে স্ট্র লাগিয়ে ডাব খাচ্ছে স্বাতী, কানের কাছে বিকেলের পেপারটা নিয়ে বিনবিন করে চলেছে দাদা। স্বাতীর কলেজে ভর্তি হওয়ার ফর্ম তুলতে কোন ভোরে গিয়ে দাদা স্কটিশ চার্চ কলেজে লাইন লাগিয়েছিল। ঘুরে ঘুরে আরও কত কলেজ থেকে ফর্ম তুলেছিল। স্বাতীর জন্যই তো...

স্বার্থ ঢুকে পড়লে ওই সম্পর্কও যে কীভাবে বদলে যায়! কবে থেকে যে পরিবর্তনটা ঘটল? মণিকাকে বিয়ের পর থেকে কী? উঁহু, স্বাতীর ওপর তখনও যথেষ্ট টান ছিল স্বপনের। গৌতম বোনের ওপর অত্যাচার করছে শুনে ফুঁসে উঠত খুব। এমনকি সেই ভয়ঙ্কর রাতে স্বাতী যখন শ্বশুরবাড়ি ছাড়া হয়ে ফিরে এল, তখনও স্বপনের কী তর্জন গর্জন! পারলে গৌতমকে যেন ছিঁড়ে খায়। সেই স্বপনই কিছুদিন পরে যেন অন্য মানুষ। স্বাতী যে আর খড়দায় ফিরবে না, এ উপলব্ধিটা বোধহয় এসেছে তখন। আর তখনই মনে হতে লাগল, স্বাতী তাদের সংসারে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। তাদের ওপর স্বাতী আর্থিকভাবে একটুও নির্ভরশীল নয়, তবুও।

তখন থেকেই কি পুরো বাড়ি দখল নেওয়ার মতলব ভাঁজছিল দাদা? বিয়ে ভেঙে চলে আসা স্বাতী বুঝি ছিল সেই পরিকল্পনার মূল অন্তরায়। স্বাতী প্রতীককে বিয়ে করার পরই স্বরূপটা প্রকাশ করেনি স্বপন। ভাবমূর্তি বজায় রাখার দায়? হবেও বা। এখন স্বাতী-প্রতীক ফ্ল্যাট ট্ল্যাট কিনে থিতু হয়েছে দেখে হাতে মোলায়েম গ্লাভস্ পরে নখ দেখাচ্ছে? লোন নিয়ে দোতলা তোলা, বাড়ির মেরামতি, সবই যে দাদার বাড়িটা গ্রাস করার ছলচাতুরির অঙ্গ, এতে কোনও সন্দেহ নেই। না হলে দাদা তো বলতেই পারত, আয় না খুকু আমরা দু'জনে খরচা করে আমাদের দোতলাটা তুলে ফেলি।

হুঁহ্, তাতে যদি বাড়ির ওপর বোনের খানিকটা অধিকার জন্মে যায়? দাদা তো ধরেই নিয়েছে ওই বাড়ি শুধু দাদার। দাদারই।

নাহ্, স্বাতীর আর ভাবতে ভাল লাগছিল না। তাতানকে নিয়ে টেনশান, গৌতমের ওই আচরণ, দাদার এই স্বার্থপরতা...স্বাতীর মেজাজটাই কেমন তেতো হয়ে যাচ্ছে। তবু বেরোতেই হল রাজর্ষির সঙ্গে। হাসি হাসি মুখে নিতে হল এক আধবুড়ো দাড়িয়ালের সাক্ষাৎকার। অর্ধসমাপ্ত কাজটা ফেলে রেখেই বেরিয়ে পড়ল অফিস ছেড়ে। বাড়ি যখন ঢুকল, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়।

বাপ মেয়েতে আজ কার্টুন দেখছিল টিভিতে। স্বাতী সেখানে বসল না, সটান গিয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায়। মিনিট পাঁচেকও কাটেনি, প্রতীক ঘরে হাজির। উদ্বিগ্ন গলায় বলল,—কী গো, শরীর খারাপ?

কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। অস্পষ্টভাবে ঠোঁট নাড়ল,—মাইগ্রেন মতো হচ্ছে।

—ওষুধ খাবে? সঙ্গে কড়া করে কফি বানিয়ে দিতে পারি। হয়তো খানিকটা বেটার ফিল করবে।

অনুমতির অপেক্ষা না করেই প্রতীক তুরন্ত ভ্যানিশ। ট্যাবলেট আর গরম কফিমগ হাতে ফিরেছে। তাড়া লাগাল,—ওঠো, ওঠো।

ওষুধের গুণেই হোক, কি কফি, একটু যেন ছাড়ল মাথা। চুলে আঙুল চালাতে চালাতে স্বাতী বসে আছে বিছানায়। গুটগুট পায়ে তিতলি দরজায়।

মেয়ের তুলতুলে মুখখানা দেখে আরও যেন ভাল হয়ে গেল মনটা। আপনাআপনি হাসি ফুটেছে স্বাতীর মুখে,—কী রে, টিভিতে কী দেখছিস?

—টম অ্যান্ড জেরি।

—ভাল লাগছিল?

—হ্যাঁ। জানো মা, টমটা খুব দুষ্টু। জেরিকে ভীষণ জ্বালায়। বলতে বলতে মার আর একটু কাছে এগিয়ে এল মেয়ে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, —দাও।

স্বাতী বিস্মিত সুরে বলল,—কী দেব?

—তুমি যে প্রমিস করলে আমার জন্য একটা জিনিস নিয়ে আসবে?

স্বাতী জিভ কাটল,—এমা, একদম ভুলে গেছি যে!

তিতলির প্রত্যাশী মুখটা কেঁমন নিভে গেল।

স্বাতী অপরাধী অপরাধী মুখে বলল,—সরি সরি। দাঁড়া, তোকে এখন একটা এক্লেয়ার দিই।

ব্যাগে দু'-চারখানা লজেন্স মজুতই থাকে সর্বক্ষণ। পথেঘাটে আচমকা ক্ষিদে পেলে স্বাতী মুখে পোরে, তাতে ক্যালরি মেলে খানিকটা। আজ যে কটা ছিল, ধরিয়ে দিল মেয়ের হাতে। জিজ্ঞেস করল,—কি, খুশি?

—আমাদের তিতলি অতি অল্পতেই খুশি। প্রতীক বলে উঠল,—তবে ওর কথা একেবারে ভুলে যেও না। আফটার অল তিতলিও তো তোমার মেয়ে।

প্রতীকের স্বরে কি ব্যঙ্গের আভাস? স্বাতী যে সারাদিন কত ধরনের চাপের মধ্যে থাকে, তা কি প্রতীক জানে না? তাতানের ওপর স্বাতীর দুর্বলতা নিয়ে কোনও ঠেস দিল না তো? মনে হয় না। প্রতীক তো গৌতমের মতো হিংসুটে স্বভাবের নয়।

প্রসঙ্গটাকে আর কচলাল না স্বাতী। আস্তে আস্তে সমে ফেরাতে চাইছে মনটাকে। রাতে খেতে বসে দাদার প্রসঙ্গটা একবার তুলবে ভাবল, কী মনে করে চেপে গেল। কথোপকথনে সযত্নে এড়িয়ে চলল তাতানকে। বরং প্রতীকের তথ্যচিত্র নিয়ে আলোচনা করল টুকটাক। উকিলবন্ধুর উপদেশ নিয়ে কী যেন একটা বলল প্রতীক, মন দিয়ে শুনলই না স্বাতী। সে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে আর কোনও ঢেউ উঠতে দেবে না হৃদয়ে।

কিন্তু হৃদয়ের গভীরে কোথায় যে কখন কীভাবে টেকটনিক প্লেট নড়ে যায়, জন্ম হয় সুনামির, কে তার খবর রাখে!

রাতে সেদিন একটা স্বপ্ন দেখছিল স্বাতী। একটা চওড়া পিচের রাস্তা ধরে হাঁটছে এক বালিকা। হাঁটতে হাঁটতেই ভেঙেচুরে যাচ্ছে রাস্তাটা। আচমকা একটা জঙ্গল গজিয়ে উঠল পথে। মেয়েটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল জঙ্গলে। হঠাৎ আবার দেখা মিলল মেয়েটার। এবার সে আর বালিকা নয়, এক লোলচর্ম বৃদ্ধা। একটা পাহাড়ের ধারে বুড়িটা পা ছড়িয়ে বসে আছে, কোলে একখানা কাঠবেড়ালি। কোত্থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠল হঠাৎ। ওমনি কাঠবেড়ালিটা লাফ মেরেছে কোল ছেড়ে। পাহাড় থেকে পিছলে যাচ্ছে কাঠবেড়ালিটা। একটা থেকে দুটো হয়ে গেল। বুড়িটা চিৎকার করছে, গলা ফাটিয়ে ডাকছে কাঠবেড়ালি দুটোকে। ওদিকে কুকুরের গর্জনও বাড়ছে ক্রমশ...

ওই গর্জনেই বুঝি স্বাতীর ঘুম ভেঙে গেল। ধকধক করছে বুকটা। উঠে বসল ধড়মড়িয়ে। গলা শুকিয়ে কাঠ, হাত বাড়িয়ে টানল জলের জগ। ঢকঢক ঢালছে গলায়।

কেন ওরকম বিদঘুটে স্বপ্ন দেখল? স্বাতী যে এক অজানা আতঙ্কে ছটফট করছে, কেউ টেরই পাচ্ছে না!

কান্না পাচ্ছিল স্বাতীর। বড্ড একা লাগছে। বড় একা।

আট

মোটর সাইকেলের স্টার্ট বন্ধ করে আড়চোখে শিবাকে দেখল গৌতম। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে নির্মীয়মাণ বাড়ির গেটটায় দাঁড়িয়ে কী যেন জ্ঞান দিচ্ছে বরুণকে।

চাবিখানা পকেটে ঢুকিয়ে গৌতম হাঁক পাড়ল,—কী রে, তুই কতক্ষণ?

শিবা এগিয়ে এল,—তা ধরো আধা ঘণ্টা। বারাসত থেকে ফিরে খেয়েদেয়েই চলে এসেছি।

—বটে?...তা কী বলছিলি বরুণকে?

—তেমন কিছু না। এই বাড়িটা আজ আর একবার ঘুরে ঘুরে দেখলাম তো...বরুণকে বোঝাচ্ছিলাম প্ল্যানে কী কী গলতি আছে।

—কী ভুল আছে প্ল্যানে?

—রেগে যেও না, আমার যা মনে হল বলছি কিন্তু। খাওয়ার জায়গার তুলনায় ড্রইং হলটা বেশ ছোট হয়ে গেছে। তারপর ধরো, অ্যাটাচড্ বাথরুমগুলো...। আমি তো পার্টিদের চয়েস শুনি, ওরা আজকাল শোওয়ার

ঘরের বাথরুমটা একটু ইয়ে রাখতে চায়। মানে বড়সড়। যাতে হাত পা খেলানো যায়।

—বকিস না তো। নেবে আটশো স্কোয়্যার ফিটের ফ্ল্যাট, সেখানে কি সুলতানি হামাম বানিয়ে দেব?

—হেঁ হেঁ, যা বলেছ। এমন আবদার করে না এক একজন।... আর্কিটেক্টরা কত ভেবেচিন্তে প্ল্যান করে...ওরা বুঝতেই চায় না।

শিবার চকিত ভোল বদলে বিস্মিত হয় না গৌতম। ছোকরা তার ভারি অনুগত, গৌতম বিরক্ত হচ্ছে টের পেলেই পলকে সাবধান হয়ে যায়। জমিবাড়ির দালালি শিবার পেশা। তবে শুধু ওই কাজে তো আজকাল পেট ভরে না, তাই শাগরেদিও করে গৌতমের। অনেক কাজে লাগে সে। পুরসভায় ছোটা, বিলপত্র জমা দেওয়া, পেমেন্টের তাগাদা, এখানে ওখানে কারোর সঙ্গে দেখা করে আসা তো আছেই। এছাড়া বিশেষ বিশেষ দিনে বরুণের পাশে পাশে থেকে কাজকর্মের তদারকিও করে সাইটে। প্রয়োজনে মারপিটটাও করতে পারে। একা নয় অবশ্য, দলবল জুটিয়ে। এমন এক আধ পিস পোষ্য না থাকলে এই ব্যবসা চালানো কঠিন।

সিগারেট শেষ করে হাতে হাত ঘষছে শিবা। একটু উৎসাহী মুখে বলল,—বারাসতে কী হল জানতে চাইলে না তো?

—হচ্ছে হচ্ছে। তুই কি এখনই কাটবি নাকি?

—না না। আছি।

—তাহলে দাঁড়া। এদিকের কাজগুলো আগে শেষ করি। বলতে বলতে গৌতম বাড়িটার তেতলার দিকে তাকাল। গলা উঁচিয়ে বলল,—বরুণ, কাজ তো কালকের জায়গাতেই থেমে আছে।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমাধারী বছর পঁয়ত্রিশের বরুণ জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল,—না গৌতমদা, ওপরে গিয়ে দেখে আসুন ব্যাক সাইডের বাঁধাবাঁধি প্রায় কমপ্লিট। পরশুর মধ্যে সামনেটাও হয়ে যাবে। চাইলে আপনি শুক্রবারই চারতলার ঢালাই করতে পারবেন।

ঢালাইয়ের দিন সাইটে উপস্থিত থাকে গৌতম। না থাকলে দুকদুক

করে বুকটা। একটা ঢালাই ফেল করা মানে অন্তত চল্লিশ হাজার টাকার লোকসান। কিন্তু শুক্রবার সারাদিন সে এখানে পড়ে থাকবে কী করে? তাতানের জন্মদিন আছে না? তেমন ঘটাপটার ব্যাপার নেই, বাড়িতে মা পায়েস টায়েস বানাবে, আর বিকেল সন্ধেয় তাতানের বন্ধুরা আসবে, কেক কাটাকাটি হবে, একটু হইচই...ব্যস। সে যাই হোক, গোটা দিনটা তো এখানে পড়ে থাকা সম্ভব নয়।

গৌতম বলল,—না, দিন এগোনোর দরকার নেই। শনিবারই হবে। লেবার একটু বেশিই রেখো। দোতলা ঢালাইয়ে বড্ড টাইম লেগেছিল।

—খেয়াল আছে গৌতমদা। আমি সেভাবেই অ্যারেঞ্জ করছি।

—ঠিক আছে। একটু চায়ের ব্যবস্থা করো তো।

বাড়িটার একতলায় একখানা ঘর মতোন করে নিয়েছে বরুণ। রাত্রে লোক থাকে কিনা। পাহারাদারি না রাখলে বাড়ি তৈরির মালমশলা সাফ হতে কতক্ষণ!

খানতিনেক দড়ির খাটিয়া রয়েছে ঘরে। একটায় গিয়ে বসল গৌতম, ডেকে নিল শিবাকে। গম্ভীর মুখে বলল,—হ্যাঁ, এবার শুনি। কী হল বারাসতে?

—আমি লোকজন সব ফিট করে এসেছি। এখন তুমি শুধু ওদের প্রোফর্মা মাফিক অ্যাপ্লিকেশান ঠুকে দাও। আর হ্যাঁ, তোমায় কিছু কাগজপত্র দিতে হবে।

—কী কাগজ?

—সরকারি কাজে যা সব লাগে আর কী। প্যানকার্ড, ভোটারকার্ডের কপি, অ্যাড্রেস প্রুফ, তোমার কোম্পানির তিন বছরের অডিট রিপোর্ট, ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন...সেও বোধহয় তিন বছর...

—বোধহয় বোধহয় করছিস কেন? লিখে আনিসনি?

—সব আমার লিস্ট করা আছে। দিয়ে দেব।

প্রোমোটারি ব্যবসায় লেগে থাকতে আর ভরসা পাচ্ছে না গৌতম। ভাবছিল, যদি লাইন বদলানো যায়। শিবাই কিছুদিন ধরে তাতাচ্ছে,

পি.ডব্লু.ডি-র কাজ ধরার জন্য বলছে গৌতমকে। তা সে তো আর এমনি মিলবে না, সরকারি তালিকায় নাম তুলতে হবে আগে। জেলা অফিসে গিয়ে তারই পদ্ধতি-টদ্ধতিগুলি জেনে এসেছে শিবা। তবে শুধু আবেদনপত্রে তো কাজ হবে না, খুঁটির জোরও দরকার। সে বন্দোবস্তটা অবশ্য গৌতম নিজেই করবে। স্থানীয় রাজনৈতিক দাদাদের সঙ্গে বাতচিৎ হয়ে গেছে, এম.এল.এ, এম.পির সার্টিফিকেট জোগাড় করে দেওয়াটা তাদেরই দায়িত্ব। বিনিময়ে মোটা কিছু দিতে থুতে হবে তো নিশ্চয়ই। তা কাজকর্ম পেলে ওই সব খরচাপাতি তো পুষিয়ে যায়, নয় কি?

চা এসে গেছে। ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে গৌতম বলল,—কাগজ সব আমার তৈরিই আছে। সামনের সপ্তাহে তুই তাহলে জমা করে দিস।

—সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে বলে কিন্তু আশা কোরো না। টাইম লাগবে। মাল তুমি যতই ছাড়, ওরা কিন্তু কাজ করবে ঢিমেতালে। প্রায় এক চুমুকে চা শেষ করে শিবা ভাঁড়টা নামিয়ে রাখল, ফের সিগারেট বার করেছে। ধরাতে গিয়েও থমকাল, —ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। জানো নিশ্চয়ই সরকারি কন্ট্রাক্টরদের গ্রেড আছে? তোমায় কিন্তু এখন নীচের গ্রেডে থাকতে হবে। মানে ছুটকোছাটকা কাজ জুটবে।

—তিন বছর পর রিভিউ করে গ্রেড বদলাবে, তাই তো? গৌতম হাসল,—আমিও একটু একটু খবর রাখি, বুঝলি। সুতরাং আমাকে টুপি পরানোর চেষ্টা কিন্তু করিস না।

—যাহ্, কী যে বলো না! তুমি আমার অন্নদাতা। আমি তোমার জন্য জান দিতে পারি।

—হয়েছে, হয়েছে। গৌতম উঠে পড়ল। মোটরসাইকেলে বসে বলল, —শনিবার কিন্তু সক্কাল সক্কাল চলে আসিস। ঢালাই আছে, থাকবি।

—তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ যে?

—বাড়ি যাব। সন্ধেবেলা আজ একটা নেমন্তন্ন আছে। বিয়ের।

—ও হ্যাঁ, বিয়ের মরশুম তো পড়ে গেল। শিবা মুখ বেঁকাল,—এই ভ্যাদভেদে গরমে লোকে যে কী সুখে বিয়ে করে!

তুই নিজে কর, তাহলে বুঝবি। কথাটা মুখে এলেও গিলে নিল গৌতম। স্টার্ট দিয়েছে মোটরসাইকেলে। গতি বাড়াতে বাড়াতে মনে হল, বিয়েটা যে খুব সুখের ব্যাপার নয়, তার চেয়ে ভাল আর কে বা জানে! তা সেই বিয়ে গরমেই হোক, কি শীতে। মাঘ মাসে বিয়ে করেও এখনও কি সে বুকে দগদগে ঘা বইছে না? অবশ্য সব ছেলের কপালেই যে স্বাতীর মতো টেঁটিয়া বউ জুটবে, তার তো কোনও কথা নেই। সত্যি, চিজ একটা কপাল করে পেয়েছিল বটে গৌতম। কী কুক্ষণে যে টিভিতে চাকরি করা মেয়েমানুষটাকে বিয়ে করল? মতিভ্রম, স্রেফ মতিভ্রম। কেন যে মনে হয়েছিল পরিবারে এবার একটু গ্ল্যামারের ছোঁয়া লাগবে? প্রথম প্রথম অবশ্য মন্দ লাগেনি। টিভির মুখখানা তার বিছানায়... সে তাকে যেভাবে খুশি রমণ করতে পারে... ভাবতে গেলেই উত্তেজনার পারদ যেন চড়ে যেত শিরা উপশিরায়। কিন্তু রোজ রোজ ন'টা-দশটা বাজিয়ে ফেরা, বিছানাতেও যেন ধুঁকছে, কাঁহাতক সহ্য হয়? তার ওপর মারও গজর গজর শুরু হয়ে গেল। স্বাতীকে সযুত করতেই পেটে বাচ্চা এনে দিল গৌতম। ফলও হয়েছিল, বড় চ্যানেলের চাকরিটা তাকে ছাড়তে হল। কিন্তু কী বেপরোয়া মেয়ে! যেই না তাতান একটু সাব্যস্ত হল, ওমনি শাশুড়ির ঘাড়ে তাকে ফেলে দিয়ে ফুড়ুৎ। ছোট চ্যানেলের চাকরি, কম মাইনে, তবু তাই করবে। ওদিকে ওইটুকু বাচ্চাকে মা খাওয়াচ্ছে, নাওয়াচ্ছে, শোয়াচ্ছে...। সাধে কি খচে যেত মা? কতবার বলা হল, চাকরি ছাড়ো, চাকরি ছাড়ো, একান্তই করতে হলে বাড়ির কাছাকাছি মাস্টারি ফাস্টারি কিছু জুটিয়ে নাও...আমলই দিল না! যতই কষ্ট হোক গৌতমের, ওই মেয়ে চলে গিয়ে তার হাড় জুড়িয়েছে। রোজ রোজ অশান্তি থেকে তো চিরতরে মুক্তি। সুখে যতই ভাটা পড়ুক, স্বস্তিটুকুরই কি মূল্য কম?

বাইক চালাতে চালাতে গৌতম বুঝি একটু বিমনা হয়ে পড়েছিল। হঠাৎই সামনে বাচ্চা কোলে এক মা। কাটানোর আর জায়গা নেই, শেষ মুহূর্তে ঘ্যাচাং ব্রেক চাপল। চোখ বুজে ফেলেছে।

পরমুহূর্তেই চোখ খুলল। নাহ্, দুর্ঘটনা ঘটেনি, থতমত খেয়ে পিছু হঠে

গেছে মহিলা। বাকি পথটুকু গৌতম আর চিত্তবৈকল্য ঘটতে দিল না। গেটের সামনে বাইক রেখে ঢুকল বাড়িতে। তরতরিয়ে উঠে এল দোতলায়।

তাতান টিভি দেখছে ঘরে। কী একটা বাচ্চাদের চ্যানেল। পরনে এখনও ইউনিফর্ম।

শার্ট খুলতে খুলতে গৌতম বলল,—কী রে, স্কুল ড্রেস ছাড়িসনি যে বড়?

পর্দা থেকে তাতানের চোখ নড়ল না। বলল,—দু' মিনিট। ডোরেমনটা শেষ হোক।

—ওফ্, নেশা বটে। কী যে দেখিস এসব?

জবাব নেই।

বাথরুম থেকে মুখে জল-টল দিয়ে বেরিয়ে এল গৌতম, তখনও তাতান একইভাবে বসে।

সামান্য বিরক্ত হয়ে গৌতম বলল,—কী রে, তোর টিভি দেখা যে শেষ হয় না? এরপর কিন্তু আমি টিভি অফ করে দেব।

এতক্ষণে কাজ হয়েছে। একটু বুঝি ভয় পেল তাতান। সাঁ করে চলে গেল পাশের ঘরে। দু' মিনিটও যায়নি, পোশাক বদলে ফের লাফাতে লাফাতে ফিরে এসেছে। চ্যানেলে সবে তখন একটা ফুটবল ম্যাচে চোখ রেখেছে গৌতম।

তাতান আবদারের সুরে বলল,—বাবা প্লিজ, এক্ষুনি সিনচ্যান শুরু হয়ে যাবে।

—ওফ্, জ্বালালি তো। গৌতম আগের চ্যানেলটায় ফিরল,—তুই খেলতে যাবি না?

—একটু পরে যাব। আগে খেয়ে নিই।

—তাহলে নীচে যাও।

—উঁহু। ঠাম্মা আমার খাবার আনছে।

—ঠাম্মাই তোর বারোটা বাজাবে। গৌতম লঘু সুরেই বলল,—ক্লাস টেস্টে খারাপ করার পরও আদরের কী ঘটা!...পড়াশোনা করছিস ঠিক মতো?

—হ্যাঁ।

—মাথায় ঢুকছে? নাকি ঠোক্কর খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে?

—ঢুকছে।

—মিছে কথা বলিস না। তোর স্যার তো সেদিন বলছিলেন তুই নাকি অঙ্ক ভীষণ ভুল করিস।

—মোটেই না। কাল আমি সব ক'টা সাম্‌স রাইট করেছি।

—বটে? আচ্ছা একটা অঙ্ক কর তো। একটা লোক বন্ধুর কাছ থেকে একশো টাকা ধার নিয়েছে। প্রথম মাসে চল্লিশ টাকা শোধ করল, দ্বিতীয় মাসে তিরিশ টাকা, তার পরের মাসে কুড়ি টাকা। আর কত টাকা বাকি রইল?

মনে মনে হিসেব কষছে তাতান। পিটপিট করছে তার চোখ জোড়া। আচমকা গৌতমের মনে পড়ল, মনে মনে কিছু ভাবার সময়ে ওইভাবেই চোখ পিটপিট করত স্বাতী। সে তো ধারেকাছেও নেই, তবু কী করে যে মায়ের মুদ্রাদোষটা ছেলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল? মুখেও বেশ মিল আছে মা-ছেলের। ঠোঁট নাক চিবুক তো পুরো মা বসানো। কেন যে রয়ে গেল মিলগুলো? তাতানের দখল সে পেয়েছে, কিন্তু ছেলের অবয়বে বাবার ছাঁচ কতটুকু? এও কি স্বাতীর কাছে এক ধরনের পরাজয় নয়?

ছোট একটা শ্বাস ফেলে গৌতম বলল,—সোজা অঙ্ক পারলি না তো?

—করছি। এক মিনিট। আমাকে আর একটু ভাবতে দাও।

ঊষা নাতির জলখাবার নিয়ে ঢুকছে। ফুলকো লুচি আর আলুভাজা। হাসি হাসি মুখে নাতিকে জিজ্ঞেস করল,—কী ভাবার কথা বলছিস রে?

তাতান বলল,—বাবা একটা অঙ্ক দিয়েছে তো...

—কী অন্যায় কথা। এটা কি অঙ্ক কষার সময়? ঊষা ঝামরে উঠল, —বরং তুই বাবাকে জিজ্ঞেস কর এবার জন্মদিনে তোকে কী দেবে?

গৌতম খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে আধশোওয়া। আয়েসি মেজাজে বলল,—তাতানই বলুক না ও কী চায়?

—এই তো মওকা। জব্বর একটা কিছু বাগিয়ে নে। নাতিকে উসকোচ্ছে ঠাকুমা,—ভাল একটা ঘড়ি চেয়ে নে।

—না, ঘড়ি নয়। তাতান আপত্তি জুড়ল,—মা আমাকে ঘড়ি দেবে বলেছে। ডিজিটাল।

ওমনি ঊষার চোখ বড় বড়,—এঁএঁহ্, মা ঘড়ি দেবে! কত যেন তোকে পোঁছে মা!

—সত্যি গো। বলেছে।

—মিথ্যে কথা বলেছে। তোর মা তোর কথা ভাবেই না। আগের বছর তোর সঙ্গে জন্মদিনে দেখা করেছিল? তার আগের বছর? মনে করে দ্যাখ।

—মার কাজ পড়ে গিয়েছিল। মা আমাকে বলেছে।

—বলল ওমনি বিশ্বাস করে নিলি? বোকার হদ্দ কোথাকার। ঊষা প্রায় ভেংচে উঠল। চোখ ঘুরিয়ে বলল,—তোর মার কাজটা কী ছিল জানিস? সে এখন অন্য সংসার নিয়ে ব্যস্ত।

—মানে?

—তোর মা তো আবার বিয়ে করেছে। একটা মেয়ে হয়েছে তার। সেই মেয়েটাকেই মা এখন বেশি ভালবাসে। তুই এখন তোর মার কাছে ফালতু।

তাতানের চোখে ঘোর অবিশ্বাস,—যাহ্, হতেই পারে না।

—সত্যি কিনা তোর বাবাকে জিজ্ঞেস কর।

তাতান গৌতমকে দেখল। ফের চোখ পিটপিট করছে,—হ্যাঁগো বাবা, সত্যি?

সহসা কোনও উত্তর দিতে পারল না গৌতম। ছেলের কাছে এতদিন ব্যাপারটা গোপনই রেখেছিল। এখন বলতে কেমন সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু কিসের কুণ্ঠা? ছেলের কাছে মার ভাবমূর্তি বজায় রাখার তার কী দায়? তবু...কেমন কেমন লাগে...

দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েই গৌতম ঘাড় নেড়ে দিল। নাকি আপনিই নড়ে গেল ঘাড়টা?

তাতানের দু' চোখের অবিশ্বাস আচমকা বদলে গেছে বিস্ময়ে। পরক্ষণে কী যে হল তার, তির বেগে চলে গেছে ঘর ছেড়ে।

গৌতম অস্বস্তিভরা মুখে বলল,—দেখেছ তো, ছেলেটা বোধহয় খুব হার্ট হল!

—তো?

—কোনও মানে হয়? তুমি এক একটা যা কাণ্ড করো না মা! কী প্রয়োজন ছিল ওকে ওসব বলার?

—কদ্দিন আর লুকিয়ে রাখবি? ঊষা নির্বিকার,—সত্যিটা তো ওর এবার জানা উচিত? ছেলে বুঝুক তার মা কেমন ধারা মা।

—আহ্, মা! তাতানের যদি এখন কোনও খারাপ রিঅ্যাকশন হয়?

—কিছু হবে না। আমরা সবাই আছি না! দ্যাখ তুই, কদিন পরে ছেলে মাকে ভুলে যাবে।

—সেটা কি তাতানের পক্ষে শুভ?

—ছেলের ওপর ওই আত্মসুখী মার ছায়া না পড়াটাই মঙ্গল। ঊষা থামল একটু। গৌতমকে দেখছে। হাওয়ায় ভাসানোর মতো করে বলল, —আরও ভাল হত, তাতান যদি একটা নতুন মা পেয়ে যেত।

—ওহ্, থামবে তুমি? ওই ফালতু কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। যাও, যাও, কাটো তো এখান থেকে।

খুব একটা হেলদোল দেখা গেল না ঊষার। বিচিত্র মুখভঙ্গি করে থালা হাতে চলে গেল পাশের ঘরে। নরম সুরে তাতানকে বলছে কী সব। বুঝি ভুলিয়েভালিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করছে।

গৌতম ভারি অসহজ বোধ করছিল। ছেলের মনে মার প্রতি বিদ্বেষ জাগানোটা কি অনুচিত নয়? তবে এটাও তো ঠিক, সত্যিটা চিরকাল আড়ালে রাখাও সম্ভব নয়। আরও বড় হয়ে অন্য কোনও সূত্রে জানতে পেরে হয়তো আরও বড় আঘাত লাগতে পারত ছেলের। তার চেয়ে বরং ঝঞ্ঝাটটা চুকে গেল, এবার ছেলেকে আস্তে আস্তে সামলে নিলেই হবে।

তবু কোথায় একটা কাঁটা ফুটছে যেন। কেন কাঁটা? কিসের কাঁটা?

টিভিতে ফের ফুটবল চালিয়ে দিল গৌতম। একটা বল নিয়ে বাইশটা

লোকের মাতামাতি—এর মাদকতা বুঝি খানিকটা শান্তির প্রলেপ বোলাল মাথায়। ঘণ্টাখানেক নেশাড়ুর মতো উপভোগ করল খেলাটা। তারপর টিভি বন্ধ করে শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। সাতটা নাগাদ উঠল বিছানা ছেড়ে। বিয়েবাড়ি যেতে হবে, তৈরি হচ্ছে ধীরেসুস্থে।

বন্ধুর বোনের বিয়ে। কাছেই, রহড়া বাজারের মুখটায়। উপহারের শাড়িখানা আলমারি থেকে বার করল গৌতম। রেখেছে খাটে। তারপর পাঞ্জাবিটা সবে গলিয়েছে, মোবাইলে ঝংকার। বন্ধুরা পৌঁছে গেছে নাকি বিয়েবাড়িতে? আজকাল মাঝে মাঝেই বিয়ে ফিয়ের অনুষ্ঠানে ডুব মারে সে, তাই ডাকাডাকি করছে নাকি?

অলস হাতেই গৌতম তুলেছিল ফোনটা। মনিটরে চোখ পড়তে জোর ঝাঁকুনি। স্বাতী!

পলকে গৌতমের স্নায়ু টানটান। গলায় বাড়তি গাম্ভীর্য এনে বলল, —আবার কী চাই?

—চাইছ তো তুমি। আচমকা স্বাতীর তীক্ষ্ণ স্বর আছড়ে পড়ল যেন, —আমি শুধু জানতে চাই তুমি কি সত্যি সত্যি ওই হোটেলে মিট করার শর্তটা দিয়েছ?

—তোমার কী মনে হয়? আমার কি তোমার সঙ্গে ঠাট্টার সম্পর্ক?

—তা তো নয়ই। ঠাট্টা রসিকতার বোধ আছে নাকি তোমার? ছিল কখনও? হুঁহ্, থাকলে তো আমি বর্তে যেতাম।

শ্লেষটা পিনের মতো ফুটল গৌতমকে। গলা চড়ে গেছে,—আমার নেচার যখন জানোই, ঢং করে আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?

—বিশ্বাস হচ্ছিল না যে। কোনও ভদ্রঘরের ছেলে এই পর্যায়ে নামতে পারে, এমনটা তো কখনও দেখিনি।

—আমার ফ্যামিলিকে ভদ্রঘর বলে কখনও মেনেছ নাকি? কী বলতে মনে নেই? গৌতম দাঁতে দাঁত ঘষল,—নর্দমার কীট, নোংরা উকুনের বেহদ্দ, আমাদের সকলের গা দিয়ে নাকি পাঁকের গন্ধ বেরোচ্ছে...!

—তুমি যেন কত মধুর ভাষা ব্যবহার করতে? তোমার বাড়িশুদ্ধু সবার মুখ দিয়ে যেন মধু ঝরত?

টগবগ রক্ত ফুটছিল গৌতমের। অনেক কষ্টে রাগটাকে বশে রেখে বলল,—আমার তর্কাতর্কিতে ইন্টারেস্ট নেই। তোমার বক্তব্যটা বলে ফ্যালো।

—আর তো আমার কিছুই বলার নেই। তুমিই বলো কবে কোথায় কোন হোটেলে হাজির হতে হবে? তোমার ইয়ে মেটাতে? নয় ধরেই নেব একটা পশু আমায় ধরে খানিকক্ষণ খাবলাল...। স্বাতীর গলা দিয়ে যেন শিসে ভরা বুলেট ছুটে আসছে। হিসহিস করে উঠল,—আশা করি, তারপরে জন্তুটা তার কথা রাখবে। তোমার ঔরসে তাতানের জন্ম দিয়ে যা পাপটা করেছি, তার শাস্তি তো আমায় পেতেই হবে। নয় কি?

—মুখ সামলে। মুখ সামলে। স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চিৎকার করে উঠল গৌতম,—ভাবলে কী করে প্রতীকের চাটা ওই শরীরটাকে আমি আবার ছোঁব? তোমার মতো মেয়েমানুষের বডিকে আমি ঘেন্না করি, ঘেন্না করি।

ওপারে বেশ খানিকক্ষণ কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারপর আবার স্বাতীর স্বর ফুটেছে। একটু যেন অবসন্ন ভাব। শ্বাস ছেড়ে বলল,—ও, সেদিন তাহলে প্যাঁচ কষছিলে? তোমার আসল মতলব জন্মদিনে আমি যেন ছেলেকে না দেখতে পাই?

—একদম বাজে কথা বলবে না। কখন আমি ওসব বলেছি, অ্যাঁ? গৌতম প্রায় ফুঁসে উঠল,—আমি সাফ সাফ জানিয়েছিলাম, তোমার হুকুম মতো দিন তারিখে ছেলেকে নিয়ে গিয়ে দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—ব্যাপারটা কি একই দাঁড়াচ্ছে না?

—মোটেই না। ছেলেকে দেখার জন্য অত যদি বুক উথালপাথাল করে, এ বাড়িতে এসে দেখে যাও।

—তো...তো...তোমাদের বাড়ি? মানে খড়দা...?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চিনে আসতে পারবে? এখনও রাস্তাটা ভোলনি?

—আমি যাব...?

—সে তোমার ইচ্ছে। বার্থ ডে-তে তাতানকে স্কুলে পাঠাব না। সারাদিন ও বাড়িতেই থাকবে।

—কখন যাব?

—দয়া করে বিকেল সন্ধেয় এসো না। তখন তাতানের কিছু বন্ধুবান্ধব আসবে। তাদের সামনে ছেলেকে নয় এমব্যারাস নাই করলে! আমাদের এই অভদ্র ফ্যামিলিটার মানসম্মান খানিকটা বাঁচে তাহলে।

স্বাতীকে আর কিছু বলার সময় না দিয়ে গৌতম মোবাইলের লাল বোতাম টিপে দিল। ধপ করে বসল বিছানায়। মেজাজ গরম করে দিয়েছে স্বাতী, ঝিমঝিম করছে মাথা। তাকে নরপশু বানিয়ে দিল স্বাতী? উফ, অসহ্য। আনন্দ অনুষ্ঠানে যাওয়ার মুডটাই চৌপাট।

হঠাৎ গৌতমের চোখ পড়েছে দরজায়। ঊষাদেবী! কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে? গৌতমের কথা গিলছিল নাকি? তার গলা চড়ে গিয়েছিল বলে...

গৌতম ভুরু কুঁচকোল,—কিছু বলবে?

—তোর কী আক্কেল রে! কপালে করাঘাত করল ঊষা,—ওই মেয়েটাকে বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে তুই অ্যালাও করলি?

—তাতে তোমার কি এল গেল? সে তো আর ঘর করতে আসছে না!

—আমিও তার জন্য বরণডালা সাজিয়ে বসে থাকব না। ঊষা মুখ বিকৃত করল,—তোমার দয়ার শরীর, তুমি গলে যেতে পারো। আমি কিন্তু ছাড়ছি না। সামনে এলে এমন ঝেড়ে কাপড় পরাব, ওই মেয়েছেলে পালাতে পথ পাবে না।

—খবরদার। টুঁ-শব্দটি করবে না। তুমি যাবেই না সামনে। গৌতম কড়া গলায় মাকে ধমকে উঠল,—একটা কথা পরিষ্কার বুঝে নাও। সে তোমার আমার কাছে আসছে না, আসবে ছেলেকে দেখতে। তোমার তো সেখানে ওপরপড়া হয়ে যাওয়ার কোনও দরকার নেই!

কথাগুলো ঊষার মোটেই মনঃপূত হয়নি। তবে ছেলের সঙ্গে বাদানুবাদে যাওয়ার সাহস পেল না। গজগজ করার মতো করে বলল,

—তুই নিজেই একসময়ে ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলি কিনা। তখন তো বলেছিলি, যেন ফের এ বাড়ির ছায়া না মাড়ায়। এখন তুইই...

—আহ্ মা, প্লিজ। পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা থামাও। আমার ভাল লাগছে না।

গোঁজ মুখে চলে গেল ঊষা। গৌতমের মাথার জ্বালা জ্বালা ভাবটা বাড়ছিল। কোর্টের হুকুমকে তো এতদিন বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে, আজ বেশি উদার হয়ে পড়ল যে? স্বাতীর গালাগাল খেয়ে? নাকি কোনও সূক্ষ্ম অপরাধবোধ কুটকুট করছিল? রাগের মাথায় সে কি ভুলভাল সিদ্ধান্ত নিল না? জন্মদিনে ছেলেকে দেখতে না দিয়ে স্বাতীকে জব্দ করবে ভেবেছিল, শেষমেশ হেরে গেল না তো?

ধুস, নিজের মনটাকে কেন যে মাঝে মাঝে এত অচেনা লাগে গৌতমের!

নয়

রাতে খেতে বসে প্রতীক বলল,—জানো তো, তোমার দাদা আজ ফোন করেছিল।

স্বাতী যেন খানিক অন্যমনস্ক। আলগাভাবে বলল,—তাই বুঝি? কী বলল?

—জিজ্ঞেস করছিলেন, রোববার সকালবেলা আমি আছি কিনা। তোমার সঙ্গে নাকি কথা হয়েছে?

—হুম্। স্বাতী মুরগির ঝোলে রুটি ডোবাল,—বলল কেন আসবে?

—তোমার স্বহস্তে বানানো আলুপরোটা খাবে। ওটা নাকি তোমার হাতেই ভাল খোলে?

—আর কিছু বলেনি?

—না তো। আরও কিছু আছে নাকি?

স্বাতী তির্যক চোখে তাকাল,—তোমার কি মনে হয় শুধু আমার হাতের আলুপরোটার লোভে সপ্তাহে তার একটা মাত্র ছুটির দিনের সকালে দমদম থেকে কসবা রাজডাঙা ছুটে আসবে?

প্রতীক হাসল মনে মনে। আন্দাজটা তাহলে তার ভুল নয়। স্বপনবাবুর বোধোদয় আর তর সইছে না!

মুখখানা ভাবলেশহীন রেখে প্রতীক বলল,—সামথিং রিগার্ডিং ইওর বাপের বাড়ি, আই প্রিজিউম?

—ঠিকই ধরেছ। আমার অংশটা নিজের নামে লিখে নিতে চায় দাদা।

—অর্থাৎ তোমার যে ন্যাচারাল রাইটটা আছে, সেটা ছেড়ে দিতে হবে। তাই তো?

—হুম্। স্বাতী যেন একটা শ্বাস ফেলল,—দমদমের বাড়িটাকে আর আমার বাড়ি বলতে পারব না।

স্বাতী বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়? খুবই স্বাভাবিক। কোন বোনই বা দাদার এই রূপটা দেখতে চায়! তবে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে এরকম আবেগের কোনও অর্থ হয় কি?

প্রতীক ঠোঁট টিপে বলল,—বি প্র্যাকটিকাল স্বাতী। এখন কি সত্যিই তুমি ও বাড়িটাকে নিজের বাড়ি বলে ভাবতে পারো?

—তা হয়তো নয়। তবু...

—এই তবুটবুগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফ্যালো। তোমার সেই প্রথম বিয়ের পর থেকেই তো ওটা তোমার বাপের বাড়িই হয়ে গেছে। তোমার বাড়ি নেই। থাকলে তোমার দাদা-বউদিরা কি তোমায় তখন অত হেনস্থা করতে পারত? সো কনসেপচুয়ালি তুমি তখনই মেনে নিয়েছিলে ওটা তোমার বাপের বাড়ি। আর পিতৃগৃহ হিসেবে ওটা ছিল তোমার একটা শেল্টার। মুখে রাইটের কথা বললেও তোমার ভেতরে তখন অধিকার-বোধটা নষ্ট হয়ে গেছে। এটা শুধু তুমি নয়, সমস্ত বিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মনে মনে জোর পেতে না বলেই তো নিজেকে তখন অতটা অসহায় ভাবতে।

—হয়তো তাই। কিন্তু এই লেখাপড়া করে রাইটটা কেড়ে নেওয়া...

—উফ, সেই একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছ। যেটা তোমার নেই, সেটাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছ। প্রতীক এবার মৃদু হাসল,—একটা কথা

অবশ্য বলতে পারো। সইয়ের বিনিময়ে থোক একটা টাকা তোমাকে দেওয়া উচিত ছিল।

—ছিলই তো। লোনের অজুহাতে বাড়িটা দাদা কায়দা করে নিজের নামে ট্রান্সফার করে নিচ্ছে...আমি তো ক্যাশ দাবি করতেই পারি।

—ছাড়ো না স্বাতী। দাদা যদি যেচে দিতেন তো ঠিক আছে। কিন্তু তুমি কেন চাইবে? তাছাড়া আমার তো মনে হয়, যা তুমি উপার্জন করোনি, সেটা তোমার প্রাপ্য নয়।

—আমি তো কিছুই চাইনি। জাস্ট তোমাকে বলছি।

—আর বলবেও না। জাস্ট ফরগেট। রবিবার সইটা সেরে দেবে, ব্যস তোমার দায় শেষ। আহার সমাপ্ত করে প্রতীক উঠে পড়ল। বেসিনে মুখ ধুয়ে এসে আবার দাঁড়িয়েছে টেবিলের সামনে। দাঁতের ফাঁকে এখনও মুরগির কুচি লেগে আছে, আঙুল দিয়ে বার করতে করতে বলল,—ও হ্যাঁ...তোমাকে জানানো হয়নি। আজ আমি ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। ছোট একটা সুসংবাদ আছে।

—কী?

—আমরা ফ্লোটিং ইন্টারেস্ট রেটে হাউস বিল্ডিং লোন নিয়েছিলাম তো, তখনকার চেয়ে সুদের হার এখন অনেকটা কমেছে। দেড় পারসেন্ট।

—ও।

—মানেটা বুঝতে পারছ? আমাদের দশ বছরের লোনটা বোধহয় আট, সাড়ে আটেই খতম হয়ে যাবে।

—তাই বুঝি?

—ইয়েস ম্যাডাম।...একটা কাজ অবশ্য করা যায়, বুঝলে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বলছিল, আমরা ইচ্ছে করলে মাসিক কিস্তিটা কিছু কমিয়ে দিতে পারি। এতে কিছু টাকার সাশ্রয় হয় আর কি। অবশ্য সুদের অ্যামাউন্টটা শেষমেশ একটু বেশিই পড়বে।

—ও।

—কী করব? কমাব? না যেমন আছে চলবে? কমাতে চাইলে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে।

স্বাতী উত্তর দিল না। থালা বাসন নিয়ে সিংকে রাখতে যাচ্ছে। প্রতীকের হঠাৎই মনে হল, স্বাতী আজ বড্ড কম কথা বলছে। শুধু খাওয়ার টেবিলেই নয়, সেই অফিস থেকে ফেরার পর থেকেই। কেমন আনমনা যেন। বাড়ি এসে মেয়ের সঙ্গে সেরকম বকর বকর করল না, মেয়েকে তেমন চটকাল না...টিভি না চালিয়েই সোফায় গিয়ে বসেছিল চুপটি করে। কিছু কি ভাবছে স্বাতী? দাদার আচরণে ক্ষুব্ধ? কিন্তু স্বপনবাবু তো কাল ফোন করেছিলেন বোনকে, কই কাল তো স্বাতীকে তেমন বিমনা দেখায়নি? একটু বোধহয় গুম মেরে ছিল, তারপর তো স্বাভাবিক হয়ে গেল। অফিসে কিছু ঘটেছে নাকি? তাহলে তো স্বাতী এসে প্রতীককে বলত নিশ্চয়ই!

ঘর থেকে ল্যাপটপখানা এনে প্রতীক সোফায় বসল। যন্ত্রটা অন করতে গিয়ে নজরে পড়ল স্বাতীকে। ঘরে যাচ্ছে। থামল দরজায়। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘুরল। এদিকেই আসছে।

স্বাতী বসতেই প্রতীক নরম গলায় বলল,—তুমি মনে হচ্ছে একটু ডিসটার্বড?

—হুঁ। বলেই স্বাতী যেন একটু নড়ে উঠল,—কই, না তো।

—তাহলে হয়তো আমার মনের ভুল।

স্বাতী নীরব। টিভির রিমোটখানা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করল, তারপর রেখে দিয়েছে পাশে। হঠাৎ বলল,—জন্মদিনে তাতানকে মিট করার একটা বন্দোবস্ত হয়েছে।

—ইজ ইট? এ তো রীতিমতো সুখবর। প্রতীকের গলায় অজান্তেই একটু ব্যঙ্গ এসে গেল,—গৌতম সরকারের সুবুদ্ধি হয়েছে তাহলে!

—ওই আর কি...

—তোমায় ফোন করে জানাল বুঝি?

—না মানে...আমিই করলাম। অফিস থেকে বেরোনোর মুখে মুখে... হঠাৎ মনে হল...

—স্ট্রেঞ্জ! সেদিন অত কথা হল, তুমি আমি উকিলের কাছে ছুটলাম... তারপরও তুমিই ফোন করলে?

—ভাবলাম ওকে কড়া করে শুনিয়ে দিই...। বলেওছি, তোমার অ্যাটিচিউডটা ঠিক নয়...তুমি এভাবে আমায় হ্যারাস করতে পার না...। ওই সব শুনেই বোধহয়...

—অ। তা কোথায় দিয়ে যাচ্ছে ছেলেকে? সেই দমদম স্টেশনেই?

—না। খড়দায়। আমি ওদের বাড়ি যাচ্ছি।

ঝং করে প্রতীকের কানে বাজল জবাবটা। অজান্তেই গোমড়া হয়ে গেছে মুখখানা। বলল,—আবার ও বাড়িতে যাবে তুমি? ওরা তোমাকে অত অপমান করার পরও?

—উপায় কী বলো? ছেলেটার জন্য বড্ড মন কেমন করছে যে। কতদিন দেখিনি বলো তো তাতানকে? প্রায় তিন মাস।

—তবু...ছেলেকে কোথাও একটা নিয়ে আসতে বলাই তোমার উচিত ছিল।

আবার স্বাতী চুপ। এক একসময়ে নীরবতাও যেন অসহ্য চাপ তৈরি করে। অনেকটা বাতাস ফুসফুসে টেনে প্রতীক বলল,—খড়দায় যাওয়ার প্রস্তাবটা বুঝি তুমিই দিলে?

—না। বিলিভ মি। স্বাতী জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল,—আমি তো আগাগোড়াই বলছি কোথাও একটা নিয়ে এসো। ও কিছুতেই রাজি হল না।

—আর তুমিও নতমস্তকে তার আদেশটা মেনে নিলে?

—বললাম তো...খুব মন কেমন করছে। স্বাতীর হাত ছুঁল প্রতীককে, —অ্যাই, তুমি কি রাগ করছ?

—এতে আমার রাগ করার কী আছে? চেষ্টা করেও ভেতরের ক্ষোভটা পুরোপুরি গোপন করতে পারল না প্রতীক। একটা তেতো সুর এসেই গেল গলায়,—তোমার যদি মানসম্মানবোধ না থাকে, তো কী করা যাবে? উঁচু নীচু যাই থাক, জল তো ঢালের দিকেই গড়ায়। নয় কী?

কথাটা কেন প্রতীক বলল, স্বাতী বুঝতে পারল কি? মনে হয় না। ল্যাপটপ বন্ধ করে ঘরে চলে এল প্রতীক। ছোট্ট ফালি ব্যালকনিটায় গিয়ে

দাঁড়াল একটু। দেখছে না কিছুই, শুধুই তাকিয়ে থাকা। আবার ফিরল ঘরে, শুয়ে পড়েছে মেয়ের পাশটিতে।

চোখ বুজেও স্বস্তি নেই। ঘুম আসছে না। কেন যে এই অস্থিরতা? পৌরুষে কোথাও আঘাত লেগেছে কি প্রতীকের? সে আর তিতলি মিলে স্বাতীকে একটা নিটোল সংসার উপহার দিয়েও ফেলে আসা জীবনটাকে স্বাতীর মন থেকে মুছে দিতে পারেনি, এটাই কি তাকে দগ্ধ করছে?

ভাবছে প্রতীক। ভেবেই চলেছে বিনিদ্র চোখে।

দশ

ঘুম ভাঙতেই স্বাতীর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। আজ তো শুক্রবার! দিনটা তাহলে এসেই গেল?

উঠেও একটুক্ষণ বিছানায় বসে রইল স্বাতী। দৃষ্টি গেছে ওয়ার্ড্রোবের মাথায়। শপিং ব্যাগটায়। গতকাল ডে অফ ছিল, বিকেলে ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করেছে তাতানের জন্যে। দু' সেট জামাপ্যান্ট। ব্র্যান্ডেড টিশার্ট। একবাক্স সুইস চকোলেট। প্যান্টশার্টগুলো তো আন্দাজে কিনল, তাতানের গায়ে হবে তো ঠিকঠাক? বাড়ের বয়স, এখনই টাইট হলে বেশিদিন পরতে পারবে না। শেষ যখন দেখেছিল, তার চেয়ে হয়তো কিছুটা বেড়ে গেছে এখন। তিন তিন মাস দেখেনি ছেলেকে! কী দীর্ঘ সময়, মনে হয় যেন কয়েক যুগ। কিংবা তারও বেশি।

যাক, আজ তো অবসান হবে প্রতীক্ষার। স্বাতী খাট থেকে নামল। বাথরুম ঘুরে পায়ে পায়ে গিয়েছে রান্নাঘরে। চায়ের জল চড়িয়ে দিল। ডিপ ফ্রিজ খুলে বার করল দুটো দুধের প্যাকেট। সিংকের কলে প্যাকেট দু'খানা ধরে রইল একটুক্ষণ। তারপর সযত্নে কেটেকুটে বসাল জ্বাল দিতে।

কেটলিতে সবে চা ভিজিয়েছে, হঠাৎ প্রতীকের গলা,—স্বাতী...? এদিকে একবার এসো তো।

—যাই।

—যাই না, এক্ষুনি এসো। কী হল...?

গ্যাস সিমে করে প্রায় দৌড়ে গেল স্বাতী,—চেঁচাচ্ছ কেন?

—তিতলির গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখো তো! কেমন ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে না?

এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি তিতলি। টাটকা ফুল হাত পা মেলে ছড়িয়ে আছে বিছানায়। পুবমুখো জানলা দিয়ে একটুকরো রোদ এসে দিব্যজ্যোতির মতো ছুঁয়ে আছে নরম পাপড়িগুলোকে।

স্বাতী হাত রাখল ফুলের কপালে। ভয়ে ভয়ে। মাথা নেড়ে বলল, —কই, না তো! নরমাল।

প্রতীক বলল,—ভাল করে দ্যাখো।

স্বাতী মেয়ের গালে গাল ছোঁয়াল। গলা ছুঁল। বুক ছুঁল। হেসে বলল, —যাহ, একেবারে ঠাণ্ডা গা হাত পা।

—অসম্ভব। থার্মোমিটার নিয়ে এসো।

—কী ছেলেমানুষি করছ? কিছু হয়নি।

—কিছু হয়নি? নাকি কিছু হলেও আজ গায়ে মাখতে চাও না?

—মানে?

—মানেটা কি বলে বোঝাতে হবে? বিছানা থেকে নেমে শরীরটা একটু ঝাঁকাল প্রতীক। নীরস গলায় বলল,—এখনও আমাদের থেকে তোমার তো ওদিকেই টান বেশি।

—আমাদের...? তুমি কী মিন করছ?

—খুবই সহজ। আমাদের মানে আমরা। আমি আর আমার মেয়ে।

—আমি নেই তোমাদের মধ্যে?

—আছ কি?

চোখের বাষ্পে মুহূর্তে ঝাপসা হয়ে গেল তিতলির মুখ। প্রতীকও। তবে কি প্রতীক কোনও দিনই মনে মনে স্বাতীর আগের জীবনটাকে মেনে

নিতে পারেনি? তাতানের অস্তিত্বকেও না? শুধুই ভান করেছে এতদিন? প্রায় চার বছর ধরে? ভান? নাকি অভিনয়? ভদ্রতার? সৌজন্যের? মহানুভবতার? এই প্রতীকই না নিজেকে প্রখর যুক্তিবাদী বলে দাবি করে! কী তার নমুনা! বউকে নিতান্তই দায়ে পড়ে তার আগের বরের বাড়ি যেতে হচ্ছে বলে মটমট করছে রাগে! ছি, সকালবেলাই একটা সিন ক্রিয়েট করে ছাড়ল!

সেই মঙ্গলবার রাত্তির থেকেই একটু একটু করে যেন খসে যাচ্ছে প্রতীকের মুখোশটা। ভেতরে ভেতরে প্রতীকও যে একটা হিংসুটে পুরুষ, সেটাও জানা হয়ে গেল স্বাতীর। অধিকারবোধে কেউ কম যায় না! সে গৌতমই হোক, কী প্রতীক! মানুষ ভেদে ডিগ্রির তারতম্য হয়, এই যা!

তেমন তারতম্যই বা কোথায়? বুধ বৃহস্পতি, দু'দিনই প্রতীক কেমন নিরাসক্ত হয়ে আছে যেন। অবশ্য শুধু স্বাতীর সঙ্গে কথা বলার সময়ে। মেয়ের সঙ্গে কিন্তু আহ্লাদিপনা চলছে সমান তালে। এটা কি স্বাতীকে আঘাত করা নয়? কাল কেনাকাটা সেরে জিনিসগুলো যখন এনে রাখল, আগ্রহ ভরে দেখাতে চাইল প্রতীককে, কী অসীম ঔদাসীন্য প্রকাশ করল প্রতীক। মুখে ভাল বলল বটে, কিন্তু সেই বলায় কোনও প্রাণ নেই। তিতলির জন্যও তো স্বাতী চকোলেট এনেছিল, মেয়েকে দিল খেতে? সোজা নিয়ে ঢুকিয়ে রাখল ফ্রিজে। প্রতীকের এ হেন আচরণে কি আহত হবে না স্বাতী? তাতানকে দেখতে যাওয়ার আনন্দটাই যেন প্রতীক মাটি করে দিতে চাইছে।

এইসব দুঃখগুলো নাড়াচাড়া করতে করতেই সংসারের কাজ সারছিল স্বাতী। নিজেদের জলখাবার বানাল, মেয়েকে তুলল ঘুম থেকে, খাওয়াল...। সবিতা এসে গেছে ন'টা নাগাদ, তাকে সঙ্গে নিয়ে হাতে হাতে সারল রান্নাবান্না। স্নান সেরে ভাত খেয়ে শাড়ি পরছে। তখনও প্রতীক গড়াগড়ি খাচ্ছে বিছানায়। পাশে তিতলি।

শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে করতে ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় নিজেকে দেখে নিচ্ছিল স্বাতী। সেই সঙ্গে প্রতীককেও। সাবধানী স্বরে জিজ্ঞেস করল, —কিগো, তুমি আজ বেরোবে না?

মেয়ের সঙ্গে খুনসুটি করতে করতে প্রতীক এদিকেই তাকিয়ে। বুঝি স্বাতীকেই দেখছে? নাকি স্বাতীর সাজগোজ?

প্রতীক মাথা নেড়ে বলল,—নাহ্, আজ বাড়িতেই আছি।

—শুক্রবার তোমার কী সব কাজ রয়েছে বলছিলে না?

—ড্রপ করে দিয়েছি।

—কেন? আমি তো আজ আর অফিস যাচ্ছি না, বিকেলের মধ্যে ফিরে আসব।

উত্তর দিল না প্রতীক। যেন প্রয়োজনই মনে করল না।

তাতানের উপহারগুলো আর একবার গুছিয়ে নিচ্ছিল স্বাতী। ভ্যানিটিব্যাগ খুলে আর একবার দেখে নিল ডিজিটাল ঘড়িটা। সকাল থেকে বুকে জমে থাকা কষ্টগুলো গলায় উঠে আসতে চাইছে যেন। কোনওরকমে নিজেদের সামলে প্রতীকের সামনে এসে দাঁড়াল। চোখে চোখ রেখে বলল, —একটা কথা জিজ্ঞেস করব? সত্যি জবাবটা দেবে?

সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে পিঠ টানটান করেছে প্রতীক। মুখে আলতো হাসি টেনে বলল,—কী?

—তুমি কি একটুও চাও না, আমি খড়দায় যাই?

—যাহ্, কী যে বলো না...! নিশ্চয়ই যাবে। আমি কি কোনওদিন কোনও কাজে তোমাকে বাধা দিয়েছি? দিই? রীতিমতো জোর করে কৃত্রিম হাসিটা চওড়া করল প্রতীক,—তোমাকে কখন কী বলেছি, এখনও তাই নিয়ে ভেবে চলেছ? তুমি কি কোনও কথাই সহজে ভুলতে পারো না?

তুমি পার? কেউই কি পারে? বলতে গিয়েও শব্দগুলো গিলে নিল স্বাতী। প্রতীকের মতো করেই হাসি মাখাতে চেষ্টা করল ঠোঁটে,—আমি মন থেকে বলছি। তোমরা যদি না চাও, আমি আজ সত্যিই যাব না।

—তোমরা মানে?

প্রতীক এবার সত্যি সত্যি হাসছে। স্বাতী কিন্তু হাসতে পারল না। বিছানার কাছটিতে গিয়ে টানল তিতলিকে। নাকে নাক ঘষল মেয়ের, চুমু খেল কপালে। ফের শান্ত চোখে তাকাল প্রতীকের দিকে,—তোমরা মানে তোমরা। তুমি। তোমার মেয়ে।

মনে মনে বলল, আমি তো বাদ। নয় কি?

বাড়িটার কাছাকাছি এসে থমকে গেল স্বাতী। পা দুটো কাঁপছে হঠাৎ। বুকের মধ্যে বিশ্রী একটা ডুবডুব শব্দ। কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ। আশ্চর্য, এত উৎসাহ, এত ছটফটানি, এত মন উচাটন, সব যেন নিমেষে উধাও। ফিরে যাবে? এতদূর এসে এখন আর ফেরা যায় কি?

ওরা যদি ঢুকতে না দেয়? তাড়িয়ে দেয় ফের? সেই ভয়ঙ্কর রাতটার মতো?

...রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। খড়দা স্টেশনে নামল সেই তরুণী। মুখেচোখে সন্ত্রস্ত ভাব। আজও বড্ড দেরি হয়ে গেল! কী করবে, এমন একটা অনুষ্ঠান কভারেজের দায়িত্ব ঘাড়ে চাপল, কিছুতেই ছুটি মিলল না তাড়াতাড়ি। কাঁহাতক ছেলের দোহাই দিয়ে কেটে পড়া যায়? সেই ছেলেও এমন কিছু দুধের শিশু নয়। আর তিন মাস পরে যার পাঁচ বছর পুরে যাবে। আজ কপালটাও খারাপ, সন্ধে থেকে বিধাননগরে রেল অবরোধ, সাড়ে ন'টার পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হল। কিন্তু তখন এমন বাদুড়ঝোলা ভিড়, তাতে ওঠে কার সাধ্য।

পা চালিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এল মেয়েটা। শ্বশুরবাড়ি কাছেই, সাধারণত হেঁটেই যাতায়াত করে, আজ সময় বাঁচাতে রিকশা নিল। মিশনপল্লির দোতলা বাড়িটার সামনে পৌঁছে হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে আরও। কোলাপসিবল গেটে তালা। অন্য দিন তো থাকে না? দেওর তো মধ্যরাত পেরিয়ে আড্ডা মেরে ফেরে, সেই তো লাগায়।

ধন্দমাখা মুখে মেয়েটি কলিংবেল বাজাল। সাড়াশব্দ নেই। দ্বিতীয়বার বাজাল। তৃতীয়বার। ঝাঁকাচ্ছে গেট। বারান্দার ওপারের দরজাটা খুলল এবার। এগিয়ে আসছে মেয়েটার শাশুড়ি। খর গলায় বলল,—তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! পইপই করে সেদিন বলে দেওয়া হল, ঘড়ির কাঁটা যেন দশটা না পেরোয়?

মেয়েটা ঢোক গিলে বলল,—আমাদের ডিউটিটা তো জানেনই। সব দিন ঘড়ি মিলিয়ে ফেরা সম্ভব হয় না।

—সেইজন্যই তো চাকরিটা ছাড়তে বলা হচ্ছে। আমাদের তুমি কেয়ার করছ না।

শাশুড়ির পিছনে এবার তার ছোট ছেলেটি আবির্ভূত হয়েছে। গলা চড়িয়ে বলল,—ব্যাপারখানা কী, অ্যাঁ? রাতদুপুর অব্দি পথেঘাটে না মারিয়ে বেড়ালে চলছে না?

—ছি, মুখ নয় তো নর্দমা! বউদির সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় শেখোনি? ভাষা তো বস্তির লোকেরও বেহদ্দ!

—অ্যাঁঅ্যাঁহ্, ভাষা দেখাচ্ছে! তোমার মতো ভাষাবতী মেয়েছেলের এখানে থাকার দরকারটা কী?

তারপর কী যে আরও বলেছিল? গৌতম প্রীতম উষারানি...? শুধু এখনও কানে বাজছে গৌতমের গলা,—মা, দরজা বন্ধ করে চলে এসো। দেখি ওই বেয়াড়া মেয়েছেলের দৌড় কত দূর!

আশপাশের বাড়ির জানলা কি খুলে গিয়েছিল তখন? নিশ্চয়ই গিয়েছিল! তবে মেয়েটার তো তখন ওই সব দেখার মতো মনের অবস্থা নয়। সে তখন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। দু'কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। মনে মনে বলছে, হে ধরণী, দ্বিধা হও...

তারপর কি মেয়েটা খুব জোরে জোরে পা চালাল? নাকি টলতে টলতে হাঁটছিল কোনও ক্রমে। নাহ্, মগজের ভিডিও ক্লিপে ওই জায়গাটা ভারি অস্পষ্ট, নড়ে গিয়েছে ক্যামেরা। পাড়া থেকে বেরিয়ে থানায় যাওয়ার কথা কি ভেবেছিল একবার? সময়টার দিকে তাকিয়ে বুঝি ভরসা হয়নি। মধ্যনিশীথে পুলিশ সহৃদয় হয়ে তাকে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবে, এত দুরাশাই বা সে করে কী ভাবে?

...অগত্যা ফের সেই খড়দা স্টেশন। বসে আছে সিমেন্টের বেঞ্চিতে। বেওয়ারিশ নেড়ি কুকুর আর ঘুমন্ত ভিখিরিদের সঙ্গী হয়ে। গোটা কয়েক সন্দেহজনক লোকও ঘুরছে প্ল্যাটফর্মে, তাদের ঘোলাটে চোখ সুবেশা মেয়েটিকে চাইছে যেন। মেয়েটার তখন পথঘাটের বিপদের দুর্ভাবনা উধাও, এক অচেনা বিমূঢ়তায় সে আচ্ছন্ন যেন।

অবশেষে ঢুকল ডাউন ট্রেন। লাস্ট কৃষ্ণনগর লোকাল। দম দেওয়া

পুতুলের মতো উঠেছে ফাঁকা লেডিজ কামরায়। দমদমে নেমে রিকশা ধরে সোজা বাপের বাড়ি।

দাদা খুলেছে দরজা। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল,—এ কী তুই? এত রাতে?

মেয়েটার স্বরযন্ত্র বিকল যেন। হঠাৎই ডুকরে উঠল দমকা কান্নায়...

মধ্যরাতে স্বাতীকে নিরাশ্রয় করে দেওয়া সেই লোকগুলোর দাঁত নখের ধার কি এখনও কমেছে? আজও কি যন্ত্রণা দেবে?

মনটাকে শক্ত করল স্বাতী। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে চেপে চেপে মুছল মুখখানা। শপিং ব্যাগটাকে এ হাত থেকে ও হাতে নিল। প্রথম আষাঢ়ের তপ্ত দুপুর তেজী পুরুষের মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে। রাস্তার বাঁদিকেই যা একফালি দুর্বল ছায়া। সেই ছায়াটুকু ধরেই এগোল পায়ে পায়ে। পথঘাট প্রায় নির্জন, আশপাশের বাড়িঘর দুপুরের স্তব্ধতায় নিঝুম। আহ্, স্বস্তি। এই সময়ে এসে একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। তখন অন্তত প্রতিবেশীদের মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।

হঠাৎই নিশ্চিন্ততাটুকুতে হোঁচট। পিকলুদের জানলায় পিকলুর মা না? তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল টেনে মুখ আড়াল করল স্বাতী। ত্রস্ত পায়ে পার হল হলুদ দোতলা বাড়িটা।

পেরিয়েই চকিতে বিরক্ত। নিজের ওপরই। ভদ্রমহিলার সঙ্গে স্বাতীর দেখা হলেই বা কী হত? না হয় দু-চারটে কৌতূহলী প্রশ্ন ছুঁড়ত মহিলা। স্বাতীর তাতে কীই বা এসে যায়? কেন নিজেকে লুকোবে চোরের মতো? সংকোচই বা কিসের? স্বাতী কি কোনও অন্যায় করেছে? শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বনেনি, ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, স্বামী স্ত্রী কেউ কারোকে সহ্য করতে পারেনি, বেড়ালের মতো আঁচড়েছে কামড়েছে, শেষে তাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ব্যস ছিঁড়ে গেছে বন্ধন। তারপর অন্য একজনকে ভাল লেগেছে, নিজের মতো করে গড়ে তুলেছে নতুন সম্পর্ক। এর কোনটা দোষের? তাছাড়া গৌতমের তো কোনও দিন নিরাপত্তা বোধে হাত পড়েনি, বিপর্যস্ত হয়েছিল শুধু স্বাতী। তখন এই পিকলুর মা-ফায়েরা ছিল কোথায়? তাহলে স্বাতী কেন তাদের পাত্তা দেবে আজ?

ভাবতে ভাবতে খানিকটা যেন জোর ফিরেছে মনে। তবু যে কেন এখনও পা কাঁপে স্বাতীর? ঝাঁঝাঁলো বাড়িটার দুয়ারে পৌঁছে হারিয়ে যায় মনের সব শক্তি? একসময়ের অতি পরিচিত লোহার গেটটাকে কী ভীষণ অচেনা লাগছে। বন্ধ দরজা যেন দরজা নয়, গৌতম, গৌতমের মা বাবা ভাই সবাই যেন দাঁড়িয়ে আছে কালো গেট হয়ে। তারও ওপারে তাতান। ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে। একভাবে বুড়ো আঙুলের নখ কেটে চলেছে দাঁতে।

তাতানের মুখ ভেসে উঠতেই সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব চুরমার। বেশ জোরেই কলিংবেল টিপে ফেলল স্বাতী।

গৌতমই বেরিয়ে এল। তালা খুলছে। কোলাপসিবল গেট ঠেলে সরিয়ে বলল,—এসো।

স্বাতী হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল। রাজডাঙার ফ্ল্যাটে প্রতীকের সামনে যে হাসি এনেছিল ঠোঁটে, অনেকটা যেন সেই হাসি। বলল,—একটু বোধহয় তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

গৌতম যেন শুনেও শুনল না। বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে স্বাতীকে সোফাটা দেখাল,—বোসো। তাতানকে পাঠাচ্ছি।

বলেই চলে যাচ্ছে অন্দরে। পিছন থেকে বেশ শীর্ণ দেখাচ্ছে গৌতমের চেহারাটা। ক'বছরেই শরীর যেন ভেঙে গেছে অনেকখানি। স্বাতীর বুকটা সামান্য চিনচিন করে উঠল। গৌতম একটু যদি...একটু যদি বুঝত স্বাতীকে। নিজের মোটা দাগের চিন্তাভাবনার বাইরে চোখ তুলে দেখতেই পারল না কোনওদিন। ফোনে কথা বলতে গিয়ে মাথা মাঝে মাঝে গরম হয়ে যায় বটে, কিন্তু পুরনো রাগটা তো আর সেভাবে নেই। এতদিন পর বুঝি আর থাকেও না। রাগটাই আস্তে আস্তে কখন যে করুণা হয়ে যায়। নাকি মায়া?

স্বাতী সামনের ছোট সোফাটায় বসেছে আলতো করে। ঘরখানা এখনও প্রায় একইরকম আছে। শুধু দরজার মাথায় পুরনো আমলের দেওয়ালঘড়ির বদলে হালফ্যাশানের ডিজিটাল ওয়াল ক্লক। শোকেসের মাথায় সেই মিনে করা ফুলদানিটা। কাচের আলমারিতে সেই সব রুপোলি সোনালি কাপ মেডেল। গৌতমেরই। ফুটবল খেলে পাওয়া। দেওয়ালে

সেই রামকৃষ্ণ, সারদা মা, বিবেকানন্দ। কেবল সোফা কভার আর দেওয়ালের রং অনেক বিবর্ণ এখন। স্বাতীর পছন্দে কেনা হয়েছিল বলেই বোধহয়...। কেন যে বদলায়নি? মাঝে একটা বিয়ে গেল...এতগুলো বছর...

চতুর্দিকে তাকাতে তাকাতে বিভ্রম জাগছিল স্বাতীর। সে কি সত্যিই চলে গেছে এ বাড়ি থেকে? এই ঘর, এই দেওয়াল, ওই ভেতর দরজা, বাইরের দরজা...! সব যেন কেমন ভুল হয়ে যাচ্ছে।

প্যাসেজে কারোর পায়ের শব্দ। ক্ষণিকের বিভ্রম ঝেড়ে স্বাতী চকিতে টানটান। কে আসছে? শ্বশুর? শাশুড়ি? প্রীতম? তার বউ? স্বাতীর ব্যগ্র চোখ পর্দায় স্থির। কিন্তু না, এ ঘরে এল না কেউ। ভারী পায়ের আওয়াজ পাশের খাওয়ার ঘরে ঢুকল বোধহয়। এখনও কি সেই বড় ডাইনিং টেবিলটাই আছে ও ঘরে? গোলাপি সাদা সানমাইকা লাগানো? টেবিল ঘিরে আটখানা চেয়ার?

কৌতূহলটা গিলে নিয়ে স্বাতী হেলান দিল সোফায়। কী আশ্চর্য, এখনও সমর ঊষা প্রীতমকে শ্বশুর শাশুড়ি দেওর বলে কেন ভাবছে? আইন তো সুতোগুলো ছিঁড়ে দিয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি চিরকাল একই জায়গায় থেমে থাকে? প্রতীকের বউ স্বাতী কেন গৌতমের মাকে শাশুড়ি ভেবে অস্বস্তিই বা বোধ করছে আজ?

ভাবনার মাঝেই পর্দা সরিয়ে এক তরুণী মুখ,—আপনি কি জল সরবত কিছু খাবেন?

প্রীতমের বউ? জল দেওয়ার অছিলায় স্বাতীকে দেখতে এসেছে?

দু'দিকে মাথা নেড়ে স্বাতী বলল,—না। ...তাতান কোথায়?

—খেয়ে উঠে ঘুমোচ্ছিল। তোলা হয়েছে। আসছে।

মিলিয়ে গেল মুখখানা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পর্দার পাশে তাতান।

সরকারবাড়ির ছেলে তাতান। গৌতমের ছেলে তাতান। স্বাতীর ছেলে তাতান।

দাঁড়িয়ে আছে তাতান। স্থির ভাবে। স্বাতী দু'হাত বাড়িয়ে ডাকল,—কী রে, আয়।

তাতান নড়ল না।

স্বাতী উঠে দাঁড়াল। চাপা উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে,—কী হল রে? কাছে আয়। আসবি না?

এই বার পায়ে পায়ে এগোচ্ছে ছেলে। মুখে ম্লান হাসির আভাস। ঠিক হাসিও নয় যেন, কান্নার মতো।

তাতান কাছে আসার আগে স্বাতীই ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাঁটু গেড়ে বসে আদর করছে ছেলেকে,—এটা তিন মাস পর দেখা হওয়ার হামি, এটা জন্মদিনের হামি, আর এটা...

তাতানের যেন কোনও হেলদোল নেই, সে আশ্চর্য রকমের নিরাবেগ।

স্বাতীর খটকা লাগল। এমন কাঠ কাঠ তো থাকে না তাতান? ফোনে ক্বচিৎ কখনও স্বাতী যখন কথা বলার সুযোগ পায়, তখনও তো তাতানকে বেশ উল্লসিত লাগে। বাড়িতে কেউ কিছু শিখিয়ে রেখেছে নাকি?

—কী রে, কথা বলছিস না যে বড়? কিছুই বলবি না? কেন রে সোনা...?

স্বাতীর গলা ধরে এল। চোখ দুটো জ্বালা করছে সহসা। আবেগ কখনও কখনও এমন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়! চোখের জল আটকাতে স্বাতী ঠোঁট জোড়া চাপছে সজোরে। একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে গলা।

ঠিক তখনই তাতানের স্বর ফুটল। সদ্য দশে পড়া ছেলে পরিপূর্ণ যুবকের গলায় প্রশ্ন করল,—তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছ কেন?

স্বাতী আকাশ থেকে পড়ল,—আমি...? তোকে...? মিথ্যে...?

—মিথ্যেই তো। আমার জন্য তোমার নাকি কষ্ট হয়? তুমি নাকি কাঁদো?

—হ্যাঁ রে। খুব কাঁদি। বিশ্বাস কর।

—লাই। তুমি আমার কথা ভাবোই না। তাতানের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ক্রমশ, —তুমি তো আবার বিয়ে করেছ। তোমার তো একটা মেয়ে আছে।

স্বাতী যেন ইলেকট্রিক শক খেল। বিড়বিড় করল,—কে বলল তোকে এসব কথা?

—আমি জানি। আমি সব জানি। তাতান দু'কোমরে হাত রাখল। ঘাড়

বেঁকিয়ে বলল,—ঠামা তো বাবাকে বলছিল, কেন তুই ওকে ডাকলি এ বাড়িতে? তুই না ওকে একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিলি? বলেছিলি, কোনও দিন যেন আর এ বাড়িতে পা না রাখে?

ছেলের মুখে কথাগুলো শুনতে শুনতে শিহরিত হচ্ছিল স্বাতী। শুধু কি ওই, আরও কত কী যে বলেছিল গৌতম? কিন্তু সেসব কথা কি কোনও দিন বলা যাবে তাতানকে? হায় কপাল, ছেলের মুখ থেকে এই কথাগুলো তার প্রাপ্য ছিল?

অদ্ভুত এক তোলপাড় চলছিল স্বাতীর মস্তিষ্কে। তাতানকে ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল স্বাতী। ব্যথিত কণ্ঠে বলল,—তুই ঠিকই শুনেছিস রে তাতান। আমার এ বাড়িতে আসা মানা।

—তাহলে এসেছ কেন?

নাহ্, এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। দিলেও কি বুঝতে পারবে ওইটুকু ছেলে? ভালবাসা শব্দটা যে বড্ড বেশি জটিল। নিজেও কি স্বাতী পুরোপুরি তার অর্থটা জানে?

তবু জবাব তো তো একটা দিতেই হবে। চোখ চেপে বন্ধ করে স্বাতী মাথা নাড়ল,—জানি না রে তাতান।

—তুমি যাও। চলে যাও। আর কক্ষনো আসবে না।

ভেজা ভেজা গলায় কথাগুলো ছুড়ে দিয়েই তিরবেগে অন্দরে চলে গেল তাতান। প্যাসেজ দিয়ে ছুটে যাওয়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এবার বোধহয় দৌড়ে উঠে গেল দোতলায়।

স্বাতী শূন্যচোখে তাকিয়ে। সোফার একপাশে শপিংব্যাগে পড়ে আছে উপহার। আনমনে ব্যাগটা তুলে শুইয়ে রাখল সোফায়। বের করল ডিজিটাল রিস্টওয়াচের বাক্সটা, রেখে দিল ব্যাগের পাশে। কোলাপসিবল গেট তো খোলাই, এবার স্বাতী বিদায় নিলেই হয়। কেউ কি আসবে বন্ধ করতে? অপেক্ষা করবে কি স্বাতী? এর পরেও?

প্রয়োজন হল না প্রতীক্ষার। গৌতম এসেছে ঘরে। ভুরু কুঁচকে বলল, —তাতান ওভাবে চলে গেল কেন?

স্বাতী মুখ ফিরিয়ে নিল। পাছে চোখের জল গৌতমের কাছে ধরা পড়ে যায়।

গৌতম গজগজ করে উঠল,—ভীষণ বেয়াদপ হয়েছে ছেলেটা। আজকাল কারোর কথা শুনছে না।

স্বাতী নীরব। আলোড়ন থেমে গেছে, এখন সমুদ্র নিথর। বুঝি বা পরবর্তী সুনামির প্রতীক্ষায়।

—ক'দিন ধরে কী যে হয়েছে, বড্ড অবাধ্যতা করছে, যাকে যা খুশি বলে দিচ্ছে। গৌতমের গলা যেন একটু কোমল,—তোমাকে কি কিছু বলল?

স্বাতী দু'দিকে মাথা নাড়ল। পেন্ডুলামের মতো।

গৌতম কী যেন ভাবছে। স্বাতীর দিকে সামান্য এগিয়েও থমকে গেল। একটা খাম বাড়িয়ে দিয়ে বলল,—এটা নিয়ে যাও।

স্বাতী ঘুরে তাকাল। গৌতম টের পাওয়ার আগেই জলীয় বাষ্পটুকু উবিয়ে দিয়েছে চোখ থেকে। শুকনো গলায় বলল,—কী ওটা?

—ওই যে বললাম সেদিন...। ইনসিওরেন্সের চিঠি। বোধহয় প্রিমিয়ামের নোটিস।

বাদামি রঙের লম্বাটে খামটা নিল স্বাতী। নেওয়ার সময়ে অনেকদিন পর চোখ পড়ল গৌতমের চোখে। কয়েক সেকেন্ড মাত্র।

গৌতমই চোখ সরিয়ে নিয়েছে। কেজো স্বরে বলল,—আমার কথাটা মাথায় রেখো।

—কী?

—অনেকদিন তো হয়ে গেল, এবার অ্যাড্রেস ট্যাড্রেসগুলো বদলে ফ্যালো। নতুন ঠিকানা তো তোমার আছেই।

—হুঁ।

একটা মাত্র ধ্বনি, তাই বার করতে এত যে বুকের বাতাস দরকার হয় কে জানত!

স্বাতী দরজার দিকে এগোল,—যাই তবে?

—তোমার কিছু বোধহয় ফেলে যাচ্ছ। গৌতম শপিংব্যাগটা দেখাল, —নেবে না ওগুলো?

—না। গলার কাছে উঠে আসা শক্ত ডেলাটা স্বাতী অতিকষ্টে গিলল, —ওগুলো সব তাতানের। জন্মদিনের উপহার।

—তো এখানে পড়ে কেন? তোমার গুণধর ছেলে বুঝি নেয়নি?

এক ঝলক গরম বাতাস বয়ে গেল স্বাতীর বুক বেয়ে। খটখটে শুকনো হয়ে গেল ভেতরটা।

স্বাতী কেটে কেটে বলল,—আমার ছেলে নয়। তোমার ছেলে। তোমাদের ছেলে।

এগারো

শেষদুপুরে রোদ্দুর মরে গেছে হঠাৎ। মেঘ জমছে আকাশে। একদম হাওয়া নেই, বিশ্রী একটা গুমোট। প্যাচপেচে গরমে মানুষের পাগল পাগল দশা।

খড়দা থেকে সোজা রাজডাঙায় ফিরল না স্বাতী। প্রতীক আজ বাড়িতে মজুত, এক্ষুনি এক্ষুনি তার মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করছে না। সব শুনলে হয়তো প্রতীক সমবেদনা জানাবে, কিন্তু সেটাই যেন কাঁটা হয়ে বিঁধবে স্বাতীকে। অফিসে চলে গেলেই ভাল হত, অন্তত কাজে ডুবে থাকত, তবে শক্তি নেই যে আর। তাতান আজ তাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

অগত্যা একটাই তো যাওয়ার জায়গা। দমদম।

স্টেশনে নেমে স্বাতী একা রিকশা নিয়েছিল। বাপের বাড়ি পৌঁছে যখন বেল বাজাল, শরীর প্রায় ছেড়ে গেছে।

মণিকা নয়, সরমা এসেছে দরজা খুলতে। অবাক মুখে বলল,—তুই? হঠাৎ?

ক্লান্ত গলায় স্বাতী বলল,—কেন, আসতে নেই?

—তা কেন। তুই আজ অফিস যাসনি?

স্বাতী ভেতরে ঢুকল। চটি ছাড়তে ছাড়তে বলল,—নাহ্, ছুটি নিয়েছি আজ।

সরমা এসেছে পিছন পিছন। বলল,—তা একা এলি যে? তিতলি কোথায়?

—বাড়িতে। প্রতীকের কাছে।

মাকে আর প্রশ্নের অবকাশ না দিয়ে সটান নিজের ঘরটায় চলে এল স্বাতী। শরীর ছেড়ে দিয়েছে সিংগলবেড খাটটায়।

পিছন পিছন সরমা সেখানেও হাজির। নিরীক্ষণ করছে মেয়েকে। সন্দিগ্ধ চোখে।

মার দৃষ্টিটা পছন্দ হচ্ছিল না স্বাতীর। অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল,—বউদি বাড়ি নেই?

—শ্যামবাজার গেছে। কীসব কেনাকাটা আছে। সরমা খাটে বসল। ভুরু কুঁচকে বলল,—তোকে এরকম লাগছে কেন রে? কী হয়েছে তোর?

—কী আবার হবে! কিছু না।

—বললেই মানব? মুখ-টুখের কী দশা হয়েছে, চোখ যেন গর্তে ঢোকা...

—বড্ড টায়ার্ড লাগছে মা। স্বাতী কপাল টিপে ধরল,—এখানে ঘণ্টাখানেক শুতে এসেছি।

সরমার দৃষ্টি তবু স্থির। তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর ক্রমশ। কথা বলতে গিয়ে গলা কাঁপছে,—ঠিক করে বল তো কী হয়েছে? প্রতীকের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস?

—না রে বাবা, না। প্রতীকের সঙ্গে কিছু হয়নি। নো ফাইট, নাথিং।

—তাহলে? সরমার চোখে তাও অবিশ্বাস,—অফিস ছুটি নিয়ে...এই সময়ে...একা একা...রাজডাঙা থেকে দমদমে তুই শুতে এলি?

স্বাতী শব্দ করে হেসে উঠল। কতক্ষণ পর যে হাসছে। কেনই বা হাসল? আদৌ হাসল কি? বিছানায় একবার আলগা গড়িয়ে নিয়ে বলল,

—তুমি এরকম উকিলের মতো জেরা শুরু করলে কেন বলো তো? তোমার কাছে আসতে গেলে আমায় দিনক্ষণ ঠিক করে আসতে হবে? ছুটির দিন...? উইক ডে...? প্রতীকের হাত ধরে? তিতলিকে ট্যাকে করে...?

সরমা তবু ভুলবার পাত্রী নয়। ঝুঁকল সামান্য। চেপে ধরেছে মেয়ের কাঁধ। গম্ভীরভাবে বলল,—তুই মিথ্যে বলছিস খুকু। আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছিস?

স্বাতী নিষ্পন্দ। এক হাতে চোখ ঢেকে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। অথবা অনন্তকাল।

সরমা হাত রেখেছে মেয়ের মাথায়। নরম গলায় বলল,—আমাকে খুলে বল তো। প্রতীকের সঙ্গে কোনও গণ্ডগোল নয় বলছিস, এদিকে...

বলতে বলতে হঠাৎ চমকাল কেন সরমা? বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মেয়ের অতীতটা কি ঝলসে উঠেছে মাথায়? তবে কি...?

স্বাতীও ঠিক তখনই বালিশ ছেড়ে মুখ গুঁজে দিয়েছে মায়ের কোলে। হু হু করে কেঁদে উঠল। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে গোটা শরীর।

সরমা অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞেস করল,—কী হয়েছে তাতানের?

খানিক কাঁদতে পেরে স্বাতী যেন একটু হালকা এবার। তবে কি এখানে সে কাঁদতে এসেছিল? এত কান্না জমেছিল বুকে?

আরও শান্ত হওয়ার পর মাথা তুলল স্বাতী। আঁচলে মুছল চোখনাক। কাঁপা কাঁপা নিশ্বাস ফেলল কয়েকটা। কথা বলতে গিয়ে তবু হেঁচকি উঠছে, —তাতানের আজ জন্মদিন ছিল মা।

—জানি। আমার মনে পড়েছে।

—ওকে দেখতে খড়দায় গিয়েছিলাম।

সরমার ভুরু জড়ো,—তোর সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি?

স্বাতী একটা বড় শ্বাস ফেলল,—না মা। তাতানই আমার সামনে থেকে চলে গেল। মিথ্যেবাদী বলল আমায়। আমি নাকি ওকে ভালবাসি না। আবার আমি বিয়ে করেছি তো তাই। আমার আবার মেয়ে হয়েছে, তাই।

—এসব তো শেখানো কথা। ওই নিয়ে মন খারাপ করিস না। সরমা মেয়ের মাথায় হাত বোলাচ্ছে,—বড় হলে ছেলে ঠিক বুঝে যাবে, বাপ কী চিজ। জানতেও পারবে, কী ব্যবহারটা করেছিল, কেন মা থাকতে পারেনি...

—পারবে বুঝতে? বলছ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই নিয়ে ভাবিস না। সরমা মেয়ের মাথা থেকে হাত সরাল,—তবে একটা কথা বলি খুকু। আজ কিন্তু খড়দা যাওয়া তোমার ঠিক হয়নি।

—না গেলে তাতানকে দেখব কী করে? ওরা যে আর কোথাও ছেলেটাকে আনল না!

—তবু...ভুলে যেও না, তুমি এখন প্রতীকের বউ। ল্যালল্যাল করে আগের শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া তোমার শোভা পায় না। ছেলেকে দেখতে হলেও না।

—কী যে তুমি বলো না মা!

—আমি ঠিকই বলি। প্রতীকের মনে আঘাত লাগতে পারে, এমন কিছু করা তোমার উচিত নয়। সরমার চোখ সরু হল,—আজ যে খড়দায় গেলি, প্রতীক জানে?

স্বাতীর চোখে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। কাল সন্ধেয় স্বাতী শপিংব্যাগ নিয়ে ফিরেছে, তিতলি ঘাঁটছে ব্যাগ, দেখছে কী এনেছে মা।

স্বাতী মিষ্টি মুখেই তিতলিকে বলল,—ওরকম কোরো না সোনা, জামাকাপড়গুলোর ভাঁজ নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রতীক ল্যাপটপে কাজ করছিল। হঠাৎই ধমক ছুঁড়ল মেয়েকে, —তিতলি ওখান থেকে সরে এসো।

তিতলি তবু নাছোড়। মাকে জিজ্ঞেস করল,—এগুলো কার জন্য মা? পাপুদাদার?

—উঁহু। তোমার আর একটা দাদার। তাতানদাদা।

—সে কে মা? আমি তো তাকে দেখিনি।

—দেখাবখন। তোমাকে একদিন তার কাছে নিয়ে যাব। কিংবা তাকেও এখানে আনতে পারি।

তখনই হঠাৎ প্রতীকের গলা উড়ে এল,—বাচ্চাদের আজেবাজে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোলাতে নেই স্বাতী।

—আজেবাজে কেন হবে! তিতলিকে একদিন তাতানের কাছে নিয়ে যেতেই পারি।

প্রতীক কেমন অদ্ভুত চোখে তাকাল তখন। কী ছিল প্রতীকের ওই দৃষ্টিতে? বিরক্তি? উপহাস? নাকি অসম্মতি? তুমি ছেলের কাছে যাবে যাও, আমার মেয়েকে নিয়ে টানাটানি কেন, এমনই কিছু? ওই দৃষ্টিতে যে বিন্দুমাত্র খুশি ছিল না, এটুকু তো পড়তে পেরেছিল স্বাতী।

সরমা আবার খোঁচাচ্ছে,—কী রে, চুপ কেন? প্রতীকের মত নিসনি?

স্বাতী জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল,—আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ওর মতের কি প্রয়োজন মা?

—বলছিস কি তুই? সরমা যেন শিউরে উঠেছে,—মেয়েদের অত ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকতে নেই। থাকলেও সেটা স্বামীকে বাদ দিয়ে নয়। এর জন্যই না তোকে একবার ভুগতে হয়েছে!

উপদেশ তো নয়, ফুটন্ত শিসের গোলা। টপ টপ ঢুকে যাচ্ছে মস্তিষ্কের কোষে। ছড়িয়ে পড়ছে শিরা উপশিরায়। বহুকাল পর সেই পুরনো অনুভূতিটা ফিরে আসছে আবার। গৌতম তাড়িয়ে দেওয়ার পর যে সময়টুকু এ বাড়িতে ছিল, প্রত্যেকটা দিন এই অনুভূতি আচ্ছন্ন করে রাখত মনটাকে। শরীরটাকেও।

তখন মাঝে মাঝে চোটপাট করত স্বাতী। আজ কিন্তু কিছুই বলল না। আদ্যিকালের সংস্কার যতই মাকে আচ্ছন্ন করে রাখুক, তার উদ্বেগটা তো নিখাদ। আর সেটা মেয়েকে ভালবাসে বলেই। মায়ের আঁকড়ে থাকা বিশ্বাসে আঘাত হেনে স্বাতীরই বা কী লাভ? প্রতীকের মতো আধুনিকমনা মানুষই এখনও পুরুষালি অহং ত্যাগ করতে পারল না, সেখানে সরমাদেবীকে বদলাতে চাওয়া কি নিছক হাস্যকর নয়?

স্বাতী দু' হাত তুলে বলল,—হয়েছে, হয়েছে, তোমার জ্ঞানের ঝাঁপি এবার বন্ধ করো তো। একটু চা করো।

—সঙ্গে খাবি কিছু? ওমলেট টমলেট?

—না। দু'খানা বিস্কুট দিতে পারো।

সরমা চলে গেল। আবার শুয়ে পড়ল স্বাতী। চোখ বুজেছে। মাথার টিপটিপ ভাবটা একটু কমেছে যেন। এই ঘর...এই ছোটবেলাকার ঘরটায় এমন এক প্রশান্তি মেলে!

—কী রে খুকু, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?

স্বাতী নড়ে উঠল,—না। চোখটা সামান্য লেগে গিয়েছিল।

মেয়ের হাতে কাপ-প্লেট ধরিয়ে দিল সরমা। ফের বসেছে খাটে। বলল,—তুই যখন এসেই পড়েছিস, একটা কাজ সেরে যাবি?

চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে মুখে পুরল স্বাতী,—কী গো?

—বাড়ির ব্যাপারে তোর কী সই লাগবে...তুই তো জানিস...কাগজটা আমার কাছে রাখা আছে। তুই আজই ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলতে পারিস।

—আজই? প্রস্তাবটা ধক করে লাগল স্বাতীর বুকে,—দাদা রোববার যাবে না?

—সে নয় যাবে। গল্পগাছা করে আসবে। জামাইয়ের সামনে সইসাবুদের কী দরকার! ভাল দেখায় না।

একটা বরফের স্রোত স্বাতীর শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। দাদা তো তাকে বঞ্চিত করার জন্য ব্যস্ত...এখন তো দেখা যাচ্ছে উৎসাহটা মাতৃদেবীরও কম নয়। না রে স্বাতী, এই ঘরটুকুও তোর আর রইল না!

দীর্ঘশ্বাস গোপন করে স্বাতী বলল,—যাও, নিয়ে এসো।

সই করে উঠে পড়ল স্বাতী। বাথরুমে গিয়ে মুখে জলের ঝাপটা দিল খানিক। ভেতরের তাপ যতটুকু প্রশমিত হয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিল চটপট।

সরমা জিজ্ঞেস করল,—এক্ষুণি যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ মা।

—আর একটু বোস। মণিকা ফিরুক।

—না মা। স্বাতী অল্প হাসল,—প্রতীককে সত্যিই জানিয়ে আসা হয়নি।

এই মিথ্যেটুকুর পর মা আর একটুও থাকতে বলবে না, জানে স্বাতী। চৌকাঠ পার হয়ে তবু ফিরল মায়ের দিকে। চিৎকার করে বলল,—তোমার মেয়ের প্রাণ খুলে কাঁদার একটা মাত্র জায়গা ছিল মা। নিজের জন্য, একেবারে নিজের জন্য। সেটুকুও আর আজ থেকে রইল না।

একটা শব্দও ফুটল না স্বাতীর গলায়।

বারো

বাসেই ব্যাগ থেকে ছাতা বার করে নিয়েছিল স্বাতী। নেমে টের পেল, ভাল মতোই এসে গেছে বৃষ্টি। সকালের ঝকঝকে দিনটা বিকেল থেকেই ক্রমশ মলিন হচ্ছিল, এখন তো গোটা আকাশটাই মেঘের দখলে। আবহাওয়া অফিসের ভয় দেখানোটা সার্থক, বোধহয় শুরু হয়ে গেল বছরের প্রথম ভারী বর্ষণ।

ছাতা খুলতে খুলতে স্বাতী রাস্তা পার হল দ্রুত। ওপারে পৌঁছনোর আগেই ঝুপ করে নিভে গেছে আলো। লোডশেডিং। মাঝে বেশ কমে গিয়েছিল, ইদানীং আবার হচ্ছে অল্পস্বল্প। হঠাৎ আলো নিভে গেলে এমন গাঢ় লাগে আঁধার! অবশ্য প্রথম কয়েক মিনিট, তারপর চোখে সয়ে যায়। জীবনের এটাই তো নিয়ম।

ক্ষণিক থমকে দাঁড়িয়ে স্বাতী চতুর্দিকটা দেখল। বাসস্টপে একটামাত্র। চায়ের দোকান, মাথা বাঁচাতে সেখানে এখন লোক থইথই। ছোট এই লেডিজ ছাতায় বৃষ্টি সামাল দেওয়া মুশকিল, ওখানেই আশ্রয় নেবে ঠেসেঠুসে?

এগোতে গিয়েও স্বাতী দাঁড়িয়ে পড়ল। আকাশের যা চেহারা, এখনই থামার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? এরপর বৃষ্টি যদি আরও বাড়ে? কী কপাল, রিকশাগুলোও আজ হাওয়া মারল? যাক গে, মরুক গে, দ্রুত পা চালিয়ে বাড়ি পৌঁছে গেলেই তো স্বস্তি। কতটুকুই বা রাস্তা, বড় জোর আট-দশ মিনিট। একটু বেশিই হয়তো ভিজবে, তা বাড়ি গিয়ে ভাল করে একটা স্নানই সেরে নেবে না হয়। এক-আধটা রিকশা অবশ্য এসে যেতেও পারে, দু'-এক মিনিট দেখে নিলে হয়...

দোলাচল কাটিয়ে স্বাতী হাঁটাই শুরু করল। আবছায়া মাড়িয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছে দুটো-একটা প্রাইভেট কার। তাদের হেডলাইটের আলোয় ঝলসে উঠছে পথঘাট। হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানিতে আকাশ ফালা ফালা। চকিত আলো দেখিয়ে পরক্ষণে বাড়িয়ে দিচ্ছে আঁধার।

বাতাস বইছে এলোমেলো। ছাতা খুলে রাখাই প্রাণান্ত, উল্টে যাচ্ছে হাওয়ায়। স্বাতী হাঁটার গতি বাড়াল। বৃষ্টি আরও তেজী হওয়ার আগে পৌঁছতেই হবে বাড়ি। আর বেশি দূরও তো নয়, বাঁদিকে ঘুরে আর একটু গিয়ে মাঠটাকে অর্ধেক বেড় দিলেই তো তাদের আবাসন। কোনওক্রমে ওইটুকু পেরোলেই...

উঁহু, শেষরক্ষা হল না। মাঠ অবধি পৌঁছনোর আগে আরও জোরে ঝাঁপিয়ে এসেছে বৃষ্টি। অন্ধকারের ঝুঁটি চেপে ঝরছে মুষলধারা। আকাশ চেরা বিদ্যুৎ হাসছে খলখল। ছাতার আর মূল্যই নেই, জলের ঝাপটায় ভিজে যাচ্ছে স্বাতীর সর্বাঙ্গ। কী তোড় রে বাবা বৃষ্টির, ধাক্কা দিয়ে বুঝি ফেলেই দেবে স্বাতীকে।

অসহায় বোধ করছিল স্বাতী। আধো অন্ধকার আর আকাশ থেকে নেমে আসা অজস্র জলকণা ভেদ করে কিছুই যেন আর দেখা যাচ্ছে না। মাঠখানা গেল কোথায়? সে কি এসেছে মাঠ অবধি? ওই মাঠের কিনার বেয়ে না গেলে কী করে পৌঁছবে তার ঠিকানায়?

কী যে করে সে এখন? দাঁড়িয়ে পড়বে? না চোখকান বুজে হাঁটবে? শেষমেশ না জানি কোথায় গিয়ে থামবে!

হঠাৎই প্রশ্ন বাজছে কানে। যেন বৃষ্টিই শুধোচ্ছে।

—তোমার নাম কী মামণি?

—খুকু। খুউকু।

—উঁহু। আদরের নাম নয়। পোশাকি নাম বলো।

—স্বাতী রায়। না না, সরকার। না, স্বাতী বসু।

—ঠিকানা কী তোমার?

জবাব এল না স্বাতীর ঠোঁটে। ভেজা হাতে প্রশ্নময় অন্ধকারকে ছুঁতে চাইল। বৃষ্টিধারা মেখে চলেছে গায়ে। সত্যিকারের কোনও ঠিকানা আছে কি তার? কখনও কি ছিল? এখন বুঝি আর সামনে নয়, শুধু পিছন ফিরে হাঁটতে পারলেই সেখানে পৌঁছতে পারে স্বাতী। যে ঠিকানা হারায় না কখনও। যে ঠিকানাই সত্য শুধু। জন্মমুহূর্ত।

উঁহু, সামনেও এক নিশ্চিত ঠিকানা আছে বৈকি। সব মানুষেরই থাকে। এমনকি চিরকাল নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজে খুঁজে ফেরা মেয়েমানুষেরও। মৃত্যু।

স্বাতী কি সেই ঠিকানার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে অনন্তকাল? এই ঘনঘোর বর্ষায়!

স্বাতী জানে না। স্বাতীরা জানে না। তবু ফের হাঁটা শুরু করল স্বাতী। বৃষ্টি গায়ে মেখে। জলকাদা মাড়িয়ে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম ভাগলপুরে, ২৫ পৌষ ১৩৫৬ (১০ জানুয়ারি, ১৯৫০)। স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে দক্ষিণ কলকাতায়। কলেজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহিত জীবনের শুরু। আবার কলেজে পড়তে পড়তেই চাকরিজীবনে প্রবেশ। বহুধরনের বিচিত্র চাকরির পর এখন সরকারি অফিসারের পদ থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন। তবে লেখালেখিতে মনোযোগী হয়েছেন সত্তর দশকের শেষ ভাগ থেকে। নারীদের একজন হয়ে তাদের নিজস্ব জগতের যন্ত্রণা, সমস্যা আর উপলব্ধির কথা লিখতে আগ্রহী তিনি। সুচিত্রার লেখাতে বারবারই ঘুরে-ফিরে আসে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের আত্মিক দিক, নানান জটিলতা। পরিশ্রমী এই লেখিকা নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। কর্নাটকের শাশ্বতী সংস্থা থেকে পেয়েছেন ননজনাগুড় থিরুমালাম্বা জাতীয় পুরস্কার ১৯৯৬। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী পদক, শরৎ সাহিত্য পুরস্কার, দ্বিজেন্দ্রলাল পুরস্কার, শৈলজানন্দ পুরস্কার, তারাশঙ্কর পুরস্কার, কথা পুরস্কার, সাহিত্যসেতু পুরস্কার প্রভৃতি। সাহিত্যম প্রকাশিত বইগুলি আঁচলপাখি, প্রেম অপ্রেম, একা জীবন, রং বদলায়, এখন হৃদয়, শূন্য থেকে শূন্য, সময় অসময়।

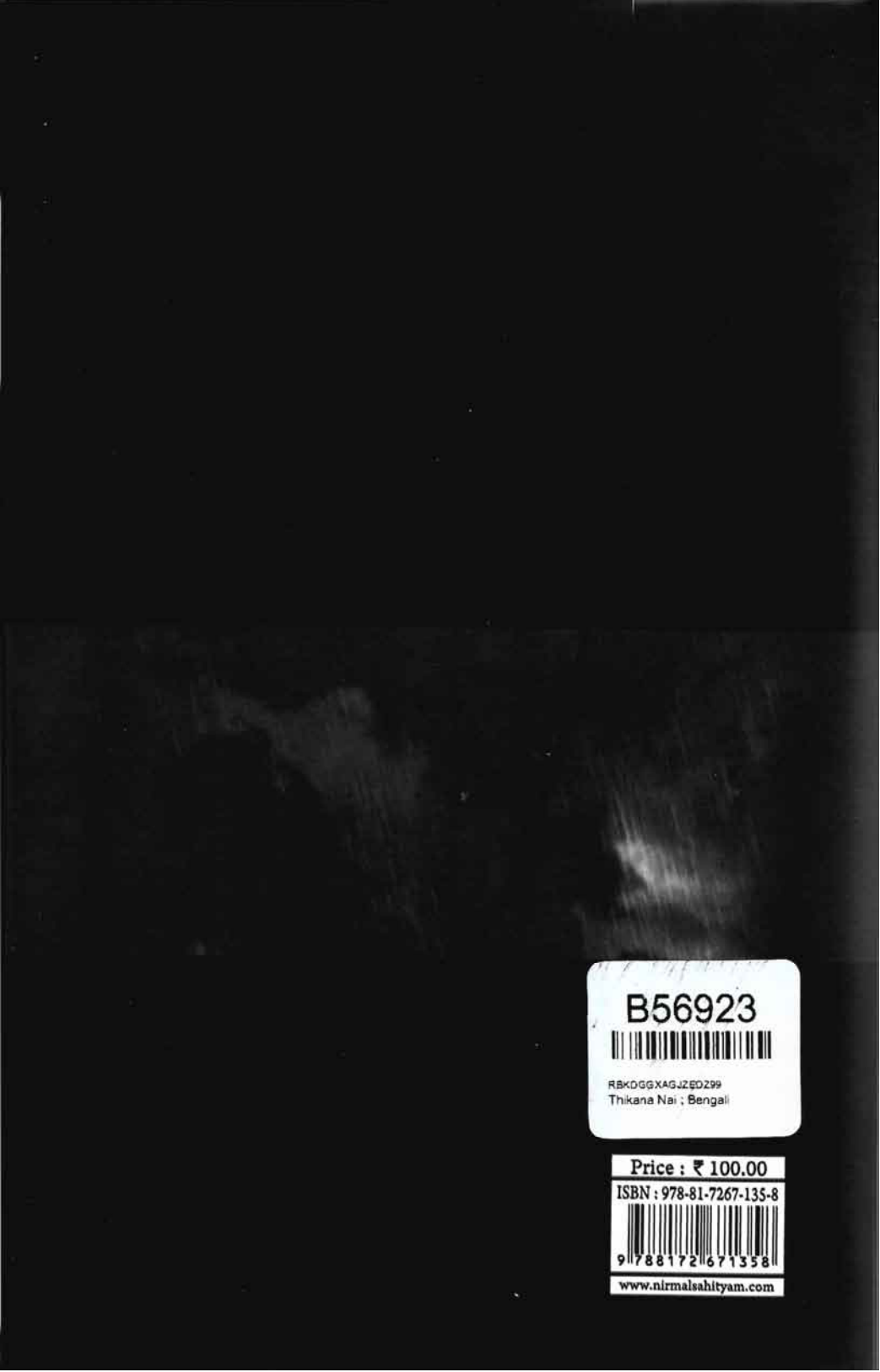

B56923
RBKDGGXAGJZEDZ99
Thikana Nai ; Bengali

Price : ₹ 100.00
ISBN : 978-81-7267-135-8
www.nirmalsahityam.com